৭.১৬ কুচক্রীর কবলে দস্যু বনহুর – Bangla Library

৭.১৬ কুচক্রীর কবলে দস্যু বনহুর – Bangla Library

কুচক্রীর কবলে দস্যু বনহুর–১১৬

বনহুর তাকিয়ে দেখলো জাহাজের চালক তিনজন সূতীক্ষ্ণধার ছোরা নিয়ে তাকে ঘিরে ধরেছে। বনহুর সম্পূর্ণ নিরস্ত্র তখন।

সে ঐ দন্ডে ভেবে নিলো কিভাবে এদের কবল হতে উদ্ধার পাওয়া যায়। সে একবার তাদের দিকে তাকিয়ে নিয়ে তাকালো নিজের শয্যার দিকে।

শয্যায় ভাঁজ করা রয়েছে তার বড় কম্বলখানা, যেটা সে রাত্রে গায়ে দেয়। ইলোরা ওটা বিছানা গোছানোর সময় সুন্দরভাবে ভাজ করে রেখেছিলো। এখনও ওর ছোঁয়া লেগে রয়েছে ঐ কম্বলখানায়।

ত্বরিতে একবার বনহুরের মনে ইলোরার কথা স্মরণ হলো। কিন্তু ভাবার সময় নেই তার, মুহূর্তে প্রস্তুত হয়ে নিলো। দ্রুতহস্তে বিছানার ওপর থেকে কম্বলখানা তুলে ছুঁড়ে দিলো ডুবু জাহাজের চালকদের ওপর। যেমন করে জেলেরা নদী বা পুকুরে জাল নিক্ষেপ করে।

চালকরা ভাবতে পারেনি বনহুর তাদের ওপরে নতুন কৌশল চালাবে। ওরা ভেবেছিলো বনহুর এখন সম্পূর্ণ নিরস্ত্র, কাজেই তাকে কাবু করা মোটেই কঠিন হবে না। বনহুরকে হত্যা করতে পারলে দুবু জাহাজখানা তাদের আয়ত্তে এসে যাবে।

যদিও তারা পারতো এ জাহাজ নিয়ে সরে পড়তে কিন্তু পারেনি, কারণ ডুবু জাহাজের হেড ইঞ্জিন মেশিনের চাবি বনহুর নিজের কাছে রেখেছিলো। তার অনুপস্থিতিতে যেন চালকরা ইলোরাকে নিয়ে ভাগতে না পারে এবং জাহাজখানা যেন তার হাতছাড়া না হয়, সেদিকে ছিলো তার অত্যন্ত খেয়াল। তা ছাড়া ইলোরাকে একা রেখে গিয়েছিলো, তাই সে সজাগ ছিলো এ ব্যাপারে।

চালকরা এ জন্যই ইচ্ছা থাকলেও পালাতে পারেনি।

বনহুর ফিরে এসে চালকদের লক্ষ্য করে বলেছিলো সব কাজ শেষ হয়েছে, এবার তোমরা

একজন প্রশ্ন করেছিলো–ইলোরা কোথায়?

বলেছিলো বনহুর–সে আর কোনোদিন ফিরে আসবে না।

চালকরা মুখ চাওয়া চাওয়ি করে নিয়েছিলো।

বনহুর বলেছিলো–হামবার্ডের অনুচরগণ তাকে হত্যা করেছে।

চালকদের চোখেমুখে বিস্ময় ফুটে উঠেছিলো, একজন বলেছিলো–ইলোরা নিহত!

হা। গম্ভীর ব্যথারুণ কণ্ঠে বলেছিলো বনহুর। তারপর ডুবুজাহাজের ইঞ্জিনকক্ষের হেড ইঞ্জিনের চাবিটা হেডচালকের হাতে দিয়ে চলে এসেছিলো নিজের ক্যাবিনে।

চালকরা বুঝতে পেরেছিলো বনহুরের মনের অবস্থা স্বাভাবিক নয়। তাই তারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে নেয়। বনহুরকে কাবু করা এখন সহজ হবে। তাকে হত্যা করতে পারলেই ডুবু জাহাজখানা সম্পূর্ণভাবে তাদের কারায়ত্ত হবে।

ডুবু জাহাজে কোটি কোটি টাকার মালামাল আছে। শুধু মালামালই নয়, আছে নানা ধরনের মেশিন। যার দ্বারা অনেক অসাধ্য সাধন করা সম্ভব হবে। চালকরা ভালভাবে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে এগিয়ে এসেছে বনহুরকে ঘায়েল করার জন্য। হামবার্ড তাদের মনিব এবং মালিক ছিলো, আর আয়ত্তে ছিলো তারা কৃতদাসের মত। নীরবে তার আদেশ পালন করে যাচ্ছিলো। এখন নতুন ফন্দি মাথায় ঢুকেছে তাদের, তারা তিনজন যুক্তি করে এসেছিলো বনহুরকে কাবু করতে।

বনহুর কম্বলটা ছুঁড়ে দিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়লো চালকদের ওপর।

ওরা হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলো।

একজন তীব্র আর্তনাদ করে উঠলো। তার নিজ হাতের ছোরাখানা সমূলে বিদ্ধ হয়েছে নিজ বুকে।

কম্বল সরিয়ে নিলো বনহুর।

একজন রক্তাক্ত দেহে ঢলে পড়েছে জাহাজের মেঝেতে।

বনহুর কম্বলখানাকেই অস্ত্র হিসেবে বেছে নিলো, আবার সে কম্বল ছুঁড়ে মারতে গেলো, তখন চালকদ্বয় নিজ হাতের ছোরা ফেলে দিয়ে করজোরে বললো–মাফ করে দাও। আর আমরা এমন কাজ করবো না।

বনহুর কম্বলখানা এবার ফেলে দিলো এক পাশে, তারপর বললো–তোমরা তিনজন ছিলে, এখন হলে দুজন। এবার আমরা তিনজন হলাম এই ডুবু জাহাজের মালিক।

একজন চালক বললো—-এই নাক–কান মলছি আর এমন কাজ করবো না। যে বেটা মরলো। সেই বেটাই আমাদের দুজনকে উদ্বুদ্ধ করেছে তোমার ওপর হামলা চালাতে।

বনহুর বললো–তাহলে ওর মৃতদেহটা তুলে সাগরের পানিতে ভাসিয়ে দাও।

চালক দুজন মৃত চালকের প্রাণহীন রক্তাক্ত দেহটা নিয়ে চলে গেলো।

বনহুর আবার এসে দাঁড়ালো সেই শার্শীর পাশে তাকালো সাগরের তলদেশে। অসংখ্য জলজীব বিচরণ করে ফিরছে।

একটা দীর্ঘশ্বাস বনহুরের বুক চিরে বেরিয়ে এলো। বারবার মনে পড়ছে ইলোরার মুখখানা। এই মুহূর্তে ইলোরার অভাবটা যেন বেশি করে অনুভব করছে বনহুর।

*

জাভেদ নদীর পাড়ে পানি পান করবার জন্য দুহাত ভরে পানি তুলে নিয়েছে, ঠিক ঐ মুহূর্তে তার চারপাশে ঘিরে দাঁড়ায় বিশ পঁচিশ জন অস্ত্রধারী পুলিশ। জাভেদ পানি পান করতে পারলো না, তাকে পাকড়াও করে ফেললো হিন্দোল পুলিশবাহিনী। শিকলে তাকে মজবুত করে বেঁধে নিয়ে চললো। হিন্দোল কারাগারে আবদ্ধ করলো তাকে।

হিন্দোলের পত্র–পত্রিকায় বের হলো জাভেদের ছবি।

সমস্ত শহরের লোক জমায়েত হলো কারাগারের বাইরে। তারা জানতে পেরেছে ঝম জঙ্গল থেকে একটি তরুণকে হিন্দোল পুলিশ বাহিনী গ্রেপ্তার করেছে। সবাই ব্যাকুলভাবে প্রতীক্ষা করছে, তারা দেখতে চায় ওকে।

এক সময় জাভেদকে লোকসম্মুখে বের করে আনা হলো। সবাই ওকে দেখে বিস্ময় প্রকাশ করলো। এমন সুন্দর বলিষ্ঠ চেহারার লোক তাদের নজরে কমই পড়েছে।

জাভেদ শৃঙখলাবদ্ধ অবস্থায় শুধু তাকিয়ে থাকে, কোনো কথা সে বলে না।

ওকে ঘিরে মানুষের মনে কত প্রশ্ন।

কে এই তরুণ?

কি এর পরিচয়?

চেহারা দেখে মনে হয় সে কোনো অভিজাত ঘরের সন্তান। চোখমুখ এবং দেহ সুঠাম সুন্দর।

কথাটা ছড়িয়ে পড়লো সমস্ত দেশে।

পত্রিকায় ছবিও দেখলো সবাই।

নানা জনের নানা ধরনের কথা।

জাভেদ কিন্তু নীরব নিস্তব্ধ। তাকে খেতে দিলে খায়, না দিলে খায় না, নিশ্চুপ বসে থাকে। তার মনে কোনো ভাবের সঞ্চার হয় কিনা সে নিজেও বুঝতে পারে না। সে কোথায় ছিলো, কে তার বাবা–মা কিছু স্মরণ করতে পারে না।

হিন্দোল পুলিশমহল বিস্ময় প্রকাশ করে।

ডাক্তার ওকে পরীক্ষা করে বলেন–লোকটি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক জ্ঞানশূন্য। তার দৈহিক শক্তি কোনো ওষুধের ফলে বেড়ে গেছে। তার চিকিৎসার দরকার।

জাভেদকে নিয়ে চললো গবেষণা এবং সেই সঙ্গে চিকিৎসা। তাকে হিন্দোল হসপিটালে ভর্তি করা হলো কিন্তু তার ক্যাবিনটি সম্পূর্ণ আলাদা রাখা হলো। বহু হিন্দোলবাসী জাভেদকে দেখার জন্য হসপিটালে ভীড় জমাতে লাগলো।

সবার মনে তাকে একনজর দেখার বাসনা, কারণ গভীর জঙ্গলে বারবার শিকারীরা তাকে দেখেছেন। শুধু দেখাই নয়, কতদিন কত শিকারী হিংস্র জন্তুর কবলে পড়লে এই তরুণ তাদের উদ্ধার করে নিয়েছে।

ওর সম্বন্ধে নানা জনের নানা কথা। অদ্ভুত এক গল্পের নায়ক এই তরুণ। তাইতো হিন্দোলবাসীর মনে ওকে নিয়ে নানা ধরনের প্রশ্ন।

হিন্দোল পুলিশবাহিনী এমন এক অদ্ভুত তরুণের কাহিনী পত্র পত্রিকায় শ্রবণ করে শুধু বিস্মিতই হয়নি, তাকে নিয়ে বিভিন্ন ধরনের আলাপ আলোচনা চলেছে।

হিন্দোলের সবচেয়ে কু ব্যবসায়ী এবং ধনকুবের মিঃ মাংসু তার বিশ্রামাগারে বসে পত্রিকাখানা চোখের সামনে মেলে ধরলো। কিছু পূর্বে পত্রিকাখানা তার হাতে

এসেছে। তারই এক কর্মচারী এই পত্রিকাটি সগ্রহ করে এনে মালিকের হাতে দেয়। পত্রিকায় মস্ত বড় করে জাভেদের ছবি ছাপা হয়েছে।

মিঃ মাংসুর চোখ দুটো জ্বলে উঠলো, এই রকম একটি লোকের দরকার তার দলে। যাকে দিয়ে অনেক অসাধ্য কাজ সাধন করা যাবে। এ রকম চিন্তা একদিন হুমায়রার বাবা সন্ন্যাসী জ্যোতিষীও মনে মনে পোষণ করেছিলো। তাকে এমন এক ওষুধ খাইয়েছিলো সন্ন্যাসী যার জন্য আজও জাভেদ সংজ্ঞাহীন। সন্ন্যাসী তারই দ্বারা তার বড় সাধনার মানিকটি উদ্ধার করে নিতে সক্ষম হয়েছিলো। তেমনি মিঃ মাংসুর মনে জাগে নতুন এক চিন্তাধারা। অজানা অচেনা এই তরুণকে পেলে তার খুব ভাল হয়।

মিঃ মাংসু শুধু কালোবাজারী অসৎ ব্যবসায়ীই ছিলো না, সে এক সময় দেশের শিশুদের হরণ করে দূরদেশে পাঠাতো। বনহুর তাকে ঘায়েল করেছিলো, এবং তার কান্দাই ঘাঁটি ধ্বংস করে তাকে হীমসাগরে নিক্ষেপ করেছিলো। সেই রঘুনাথ এসে হিন্দোলে আস্তানা গেড়েছে, নতুন নাম। ধারণ করেছে–সে মিঃ মাংসু।

বনহুর যেন কোনো দিন আর তার সন্ধান না পায় এ জন্য তার সাবধানতার অন্ত ছিলো না। কান্দাই পুলিশবাহিনী তাকে কাবু করতে পারেনি কিন্তু সে রেহাই পায়নি বনহুরের কাছে।

কান্দাই শহরে সে এক পোড়োবাড়িতে আত্মগোপন করে অসৎ কাজে লিপ্ত থাকতো। তার চোরা কারবার চলতো কিছু সংখ্যক নেতৃস্থানীয় লোকজনদের সঙ্গে। কাজেই সাহস ছিলো তার অপরিসীম। কিন্তু বনহুর তার সে সাহসকে চূর্ণ করে দিয়েছিলো, তার সমস্ত ব্যবসা বানচাল করে দিয়েছিলো। সে কারণেই মিঃ মাংসু হিন্দোল গিয়ে নতুন আস্তানা স্থাপন করেছিলো এবং পুনরায় অসৎ ব্যবসায় লিপ্ত হয়েছিলো।

মিঃ মাংসু যখন পত্রিকায় দেখলো এমন একটি অসাধারণ তরুণ হিন্দোল হসপিটালে চিকিৎসাধীন রয়েছে তখন সে তাকে নিজের দলে নেয়ার ইচ্ছা পোষণ করলো মনে প্রাণে।

প্রধান সহচর মিঃ রাওয়ানকে বললো মিঃ মাংসু–পত্রিকাখানা পড়েছো?

বললো মিঃ রাওয়ান–হা পড়েছি।

এই তরুণটিকে আমাদের চাই। গম্ভীর কণ্ঠে বললো মিঃ মাংসু। আরও বললো সে–আজ রাতেই এই তরুণকে হিন্দোল হসপিটাল থেকে সরিয়ে নিতে হবে।

চললো তাদের মধ্যে নানা ধরনের কু পরামর্শ।

সেই দিনই গভীর রাতে হসপিটালের বেড থেকে উধাও হলো তরুণ রোগী জাভেদ।

নার্স বা ডাক্তার কেউ জানে না তাদের নতুন পেসেন্ট কোথায় গেলো।

আবার পুলিশমহলের চললো সন্ধান।

হসপিটালে কর্মরত ডাক্তার এবং নার্সগণ সবার মনেই প্রশ্ন–তাদের এই অদ্ভুত রোগীটা গেলো কোথায়?

পত্রিকাগুলোতে প্রচারিত হলো তার এই উধাওর সংবাদ।

সমস্ত শহরে আবার একটা নতুন আলোড়ন সৃষ্টি হলো। সবাই খুঁজে চলেছে জাভেদকে।

হিন্দোল শহরে যখন জাভেদকে নিয়ে নানা ধরনের আলোচনা চলছে, তখন মিঃ মাংসুর গোপন আড্ডাখানায় জাভেদকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় একটা বিছানায় শুইয়ে রাখা হয়েছে। তার পাশে দন্ডায়মান অবস্থায় রয়েছে কুচক্রী মিঃ মাংসু আর তার সহচর মিঃ রাওয়ান।

ডাক্তার দুজন জাভেদের ওপর ঝুঁকে তাকে পরীক্ষা করছেন।

ডাক্তার দুজনকেও কুচক্রী মিঃ মাংসু ও মিঃ রাওয়ান পাকড়াও করে এনেছে। জাভেদের মস্তিষ্কে চলে পরীক্ষা–নিরীক্ষা।

এক সময় সম্বিৎ ফিরে আসে জাভেদের।

মিঃ মাংসুর আর মিঃ রাওয়ানের মুখে হাসি ফুটে ওঠে।

তাদের প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছে।

জাভেদ ঠিক বুঝতে পারে না সে এখন কোথায়। সব যেন কেমন এলোমেলো লাগে তার কাছে।

ওদের লোক খাবার আনে জাভেদ খায়, কারণ ক্ষুধা তাকে খেতে বাধ্য করে। ওষুধ আনে, না খেয়ে উপায় থাকে না, খায় সে।

ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠে জাভেদ।

পুলিশবাহিনী যখন তাকে আটক করেছিলো তখন সে কিছুটা আহত হয়েছিলো। এ কারণেই পুলিশপ্রধান তাকে হসপিটালে ভর্তি করেন এবং সেখানে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন।

কিন্তু হসপিটালের বেড থেকে তরুণটি উধাও হওয়ায় পুলিশ মহল ভীষণ ঘাবড়ে গেলেন। তারা পুনরায় সন্ধান চালালেন তরুণটিকে খুঁজে বের করার জন্য।

পুলিশ মহল যখন পুনরায় সন্ধান করে ফিরছে তখন মিঃ মাংসু জাভেদকে নিয়ে সমুদ্রপথে যাত্রা করলো। বুঝতে পেরেছে মাংসু জাভেদকে হাতের মধ্যে রাখতে হলে তাকে হিন্দোল ত্যাগ করতে হবে।

জাহাজ নিয়ে মিঃ মাংসু চললো।

তার সঙ্গী হিসেবে সঙ্গে রইলো কয়েকজন অনুচর আর জাভেদ। জাভেদকে কড়া পাহারায় রাতের অন্ধকারে জাহাজে তুলে নেওয়া হলো। হিন্দোলবাসীদের কেউ জানলো না ছেলেটা গেলো কোথায়।

মিঃ মাংসু জাহাজ নিয়ে পাড়ি জমালো তার গোপন আস্তানার উদ্দেশ্যে।

জাহাজখানা চলেছে।

সার্চলাইটের আলো ফেলে সামনে এবং আশেপাশে লক্ষ করছে মাংসু ও তার অনুচররা। মাংস জানে হঠাৎ কোনো ডুবুপর্বতে ধাক্কা খেয়ে তাদের জাহাজের তলদেশ ফেঁসে যেতে পারে। এ কারণে তার জাহাজের নাবিকগণকে ভালভাবে নির্দেশ দিলো তারা যেন সাবধানে জাহাজখানাকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

গভীর রাতে রওয়না দিলেও একটা আশংকা জাগছিলো মিঃ মাংসুর মনে, হিন্দোল পুলিশবাহিনী জলপথেও সন্ধান করে ফিরছে।

জাহাজে যাত্রা করেও মিঃ মাংসুর মন সন্দেহমুক্ত ছিলো না। একটা শংকা সদাসর্বদা তাকে আশংকিত করে তুলছিলো। তরুণটি সাধারণ নয়, ওকে বশীভূত করতে পারলে অনেক কাজ ওর দ্বারা সমাধা করে যাবে।

অবশ্য একটা কারণ ছিলো যা মাংসু কারও কাছে প্রকাশ করেনি। যে তরুণটিকে আজ সে হাতের মুঠায় পেয়েছে সে সাধারণ নয়। গোপন স্থান হতে একটি ফটো বের করে সে চোখের সামনে মেলে ধরেছিলো, মিলিয়ে দেখেছিলো পত্রিকায় ছাপানো ছবিটার সঙ্গে।

ফটোখানার সঙ্গে কিছুটা মিল ছিলো আহত তরুণটির। সে কারণেই তার এত বেশি প্রয়োজন

ঐ ফটোখানা দস্যু বনহুরের।

বনহুর তাকে নাজেহাল করেছিলো।

এমন কি তার আস্তানা ধ্বংস করে দিয়েছিলো। তাকে দেশচ্যুত করেছিলো বনহুর। এ রাগ তার কোনোদিনই যাবে না। এই তরুণের সঙ্গে বনহুরের চেহারার মিল আছে, তাই মিঃ মাংসু চায় সত্যি যদি বনহুরের সঙ্গে এই তরুণের কোনো সম্বন্ধ থেকে থাকে তাহলে ভাল হয়। শুধু ওকে দিয়ে কার্যোদ্ধারই হবে না, প্রতিশোধও নেয়া হবে। বনহুরকে কাবু করার একটি পথ যেন সে খুঁজে পায়।

মিঃ মাংসু জানতো না তারই জাহাজের তলদেশ দিয়ে একটি জাহাজ এগিয়ে আসছে, যে জাহাজে রয়েছে দস্যু বনহুর স্বয়ং।

কুচক্রী মিঃ মাংসু নিশ্চিন্ত মনে জাহাজ নিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে পাড়ি জমিয়েছে। রায়হান বন্দরে তার জাহাজ নোঙ্গর করবে, এবং সেখান হতে তারা মোটরযোগে যাবে গন্তব্যস্থানে।

প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দিয়েই এগিয়ে আসছে হামবার্ডের ডুবু জাহাজ। প্রশান্ত মহাসাগর হয়েই ঝাম সাগরে আসবে–তারপর নীলনদ, এরপর কান্দাই সমুদ্র। এখানে পৌঁছানোর পর বনহুর ফিরে আসবে কান্দাই আস্তানায়।

বনহুর জলদস্যু হামবার্ডের ডুবু জাহাজের সবগুলো মেশিন সম্বন্ধে জেনে নিয়েছিলো। কোনো মেশিন চালানো তার অসাধ্য ছিলো না। যতটুকু না জানতো ততটুকু জেনে নিলো চালক দুজনের কাছে।

বনহুর ডুবু জাহাজটির নাম দিয়েছিলে হামবার্ড। কারণ এ জাহাজখানার মালিক ছিলো যে, তারই নামে এ জাহাজটির নামকরণ হলো।

জাহাজটি যখন হামবার্ডের নিজস্ব ছিলো তখন এই জাহাজখানার নাম ছিলো ফিরু। ফিরু নামে হামবার্ডের এক অনুচর ছিলো। সে এই ডুবুজাহাজের ইঞ্জিনের চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যুবরণ করেছিলো, তাই হামবার্ড জাহাজখানার নাম ফিরু রেখেছিলো। অবশ্য বনহুর কথাটা শুনেছিলো চালকদের কাছে। চালকরাই ইচ্ছা প্রকাশ করে এবার জাহাজখানার নাম হবে হামবার্ড, কারণ হামবার্ড এ জাহাজের মালিক ছিলো এবং তার মৃত্যু ঘটেছে এই জাহাজেরই ইঞ্জিনের চাকায় পিষ্ট হয়ে।

বনহুর ওদের ইচ্ছা পূর্ণ করেছে।

চালকরা এবার বুঝতে পেরেছে বনহুরকে হত্যা করার চেষ্টা তাদের জীবননাশের কারণ হয়ে দাঁড়াবে এবং তারা জানে বনহুরকে কাবু করা তাদের অসাধ্য। কাজেই তাকে মনিব হিসেবে মেনে নেওয়াই শ্রেয়।

কদিনে বনহুর বেশ সহ্য করে নিয়েছে, জেনেও নিয়েছে অনেক কিছু।

বনহুর ভাবছিলো মণীষা দ্বীপ নিয়ে।

মিঃ আহাদ চৌধুরী বলেছিলেন–মণীষা দ্বীপের অভ্যন্তরে গভীর এক রহস্য লুকিয়ে আছে যে রহস্য মণীষা দ্বীপবাসীর জীবনকে করে তুলেছে অভিশপ্ত। যে আলোকস্তম্ভটি মণীষা দ্বীপের পাদমূলে সাগরবক্ষে ধসে পড়েছে ঐ স্তম্ভের গরেই ছিলো এই–রহস্যের মূল সূত্র। হামবার্ড ছিলো সেই রহস্যের অধিনায়ক। বনহুর একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে, হামবার্ড আর কোনোদিন ফিরে আসবে না। আর কোনোদিন সে মণীষা দ্বীপবাসীদের জীবনকে অনিশ্চিত মৃত্যুর কোলে ঠেলে দিতে সক্ষম হবে না। হামবার্ড ভীষণ এক ষড়যন্ত্র করেছিলো, সে সবার অলক্ষে সাগরগর্ভে চালিয়েছিলো মারণাস্ত্র তৈরির ব্যবসা। এন অস্ত্র দিয়ে এক একটি দেশকে সে সমূলে ধ্বংস করতে পারতো। সেই অস্ত্র তৈরি করে বিভিন্ন সময়ে সাগরের গভীর অতলে বিস্ফোরণ ঘটাতে এবং সেই মারণাস্ত্রের বিস্ফোরণ মণীষা

দ্বীপবাসীর জীবনাশের কারণ হয়ে দাঁড়াতো। সেই ভয়ংকর অস্ত্র পরীক্ষাকালে যে বিস্ফোরণ ঘটতে তা ছিলো সাংঘাতিক আর প্রচন্ড……।

বনহুর যখন এসব নিয়ে ভাবছে তখন চালকদের একজনের কণ্ঠে মাইক্রোফোনে শোনা গেলো……সম্মুখে দেখা যাচ্ছে একটি জাহাজ। যদিও জাহাজখানা আমাদের ডুবুজাহাজ থেকে এখন বহুদূরে দৃষ্টিগোচর হচ্ছে কিন্তু আমাদের বাইনোকুলারে জাহাজখানাকে অন্যরূপ মনে হচ্ছে, কতকটা কিম্ভুতকিমাকার। এ জাহাজখানা সাধারণ নয় বলে মনে করছি……।

প্রথম চালক বর্ণের কণ্ঠস্বরে বনহুর সচকিত হয়ে উঠলো। তাড়াতাড়ি দ্বিতীয় ক্যাবিনে যেখানে বিভিন্ন ধরনের মেশিন রয়েছে ঐ ক্যাবিনে এসে আসন গ্রহণ করলো। সম্মুখে টেলিভিশন পর্দা। অনেকগুলো হ্যাঁভেল এবং সুইচ রয়েছে। আসনটি এমন স্থানে যার চারপাশে রয়েছে এ সব সুইচ আর হ্যান্ডেলের চাকা। পাশে ক্যাবিনে দেয়ালে নানা ধরনের ম্যাপ। ম্যাপের মাঝে স্থানে স্থানে আলোর বাল্ব রয়েছে।

আসনের পেছনে মস্ত বড় একটি মানুষের কংকালের ছবি।

ছবিটার পেছনে জাহাজের ইঞ্জিনের দাঁতগুলো অবিরাম চক্রাকারে ঘুরছে। ভয়ংকর আর। ভীষণ এই মেশিনকক্ষ। বনহুর আজ এসব চলনা সম্বন্ধে অজ্ঞ নয়। সে সব কিছু জেনে নিয়েছিলো। এক দিনে।

বনহুর ক্যাপ্টেন বার্নের কথা শোনামাত্র মেশিন–কেবিনে এসে আসন গ্রহণ করল এবং সম্মুখস্থ টেলিভিশন পর্দায় দৃষ্টি রেখে সুইস টিপলো।

সঙ্গে সঙ্গে সম্মুখস্থ টেলিভিশন পর্দায় ভেসে উঠলো সেই জাহাজখানির ছবি। উত্তাল তরঙ্গ চিরে এগিয়ে আসছে একটি জাহাজ। সহসা ওটাকে জাহাজ বলে মনে হয় না, ভাসমান কোনো জীব বলেই ধারণা হয়। বনহুর ভালভাবে লক্ষ করলো, তারপর আবার দ্বিতীয় সুইচ টিপলো এবং একটি হ্যান্ডেল ঘোরাতে লাগলো।

এবার জাহাজের ভিতরের অংশ দেখা যাচ্ছে। সমস্ত জাহাজখানার অভ্যন্তরে নজর পড়ছে। বিস্মিত হলো বনহুর। জাহাজখানাকে কিছুত কিমাকার মনে হলেও তার ভিতরে সাধারণ জাহাজের মত ক্যাবিন এবং বিভিন্ন সবকিছু রয়েছে।

হঠাৎ চমকে উঠলো বনহুর।

একটি ক্যাবিনে শায়িত অবস্থায় একটি তরুণকে দেখা যাচ্ছে। মাত্র সাত আট জন লোক জাহাজটিতে রয়েছে বলে মনে হচ্ছে।

কিন্তু তরুণটি কে?

তার চেহারা জাভেদের মত মনে হচ্ছে।

তবে কি জাভেদ?

আশায় আনন্দে বনহুরের চোখ দুটো চকচক করে উঠলো। নিশ্চয়ই ওরা তার জাভেদকে আবিষ্কার করেছে। যেমন করে হোক ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। তবে ওরা ভাল উদ্দেশ্য নিয়ে জাভেদকে গ্রহণ করেছে না মন্দ অভিসন্ধি আছে ঠিক বুঝতে পারে না বনহুর।

বনহুর ভালভাবে লক্ষ করে চপলো।

ভাল করে চিনতে চেষ্টা করে যাকে সে এ মুহূর্তে ঐ বিস্ময়কর জাহাজে দেখতে পাছে সে–ই জাভেদ কিনা। সে নাও হতে পারে, অমন চেহারার অন্য কেউ তো হতে পারে। কিন্তু তার মন বলছে ঐ ব্যক্তিই তার জাভেদ।

কিন্তু বেশিক্ষণ জাভেদকে নিয়ে ভাববার সময় নেই। ঐ বিস্ময়কর জাহাজখানার অভ্যন্তরে কি আছে ওরা কারা এ সব লক্ষ করে চললো বনহুর।

বেশিক্ষণ লাগলো না তার জানতে।

মিঃ মাংসুকে বনহুর চিনে ফেললো কিছুক্ষণের মধ্যেই, মাংসুর পরিচয় বনহুর পূর্ব হতেই জানে। বিশ্বের কুচক্রীদের অধিনায়ক সে।

জাহাজখানা অনেক এগিয়ে এসেছে।

এখন আরও স্পষ্ট লাগছে সবকিছু।

বনহুর একটির পর একটি বোতাম টিপছে। দৃষ্টি তার টেলিভিশন পর্দায়।

এবার বনহুর ক্যাপ্টেন বার্নকে লক্ষ্য করে মাইক্রোফোনে বললো–বার্ন, ঐ জাহাজখানার নিকটে এগিয়ে চলো। সাবধান, ঐ জাহাজখানার সঙ্গে আমাদের জাহাজের সংঘর্ষ যেন না ঘটে।

জবাব এলো, বার্নের গলা–আপনার নির্দেশমত আমরা জাহাজখানাকে এগিয়ে নিয়ে যাবো।

দ্বিতীয় চালক ক্যাপ্টেন লরলিং–এর কণ্ঠস্বর–স্যার, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন আমরা ঠিকমত এগিয়ে যাচ্ছি। আপনি টেলিভিশন পর্দায় দৃষ্টি রাখুন....

বনহুর কতকটা নিশ্চিন্ত হলো।

ঠিকভাবে জাহাজ চালনা হচ্ছে কিনা লক্ষ করতে লাগলো সে জাহাজের তলদেশ স্পষ্ট নজরে পড়ছে এবার। অবশ্য বনহুর এক একবার এক একটি সুইচ টিপে চললো।

সম্মুখের জাহাজখানাই তাদের লক্ষ্য।

তবুও সাগরতলে লক্ষ করতে হচ্ছে অন্য কোনো ডুবুজাহাজে তাদের ডুবুজাহাজ আঘাত না খায়। সাগরতলে ডুবন্ত ছোট ছোট অনেক পাহাড় রয়েছে। অনেক ধরনের জীব নজরে পড়ছে। বিভিন্ন ধরনের প্রবাল আর সামুদ্রিক উদ্ভিদ দেখা যাচ্ছে। তারই মাঝে মধ্যে বৃহৎ বৃহৎ জলজীব।

প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দিচ্ছে মিঃ মাংসু।

সে জানতো না প্রশান্ত মহাসাগরের তলদেশ বেয়ে এগিয়ে আসছে বনহুর হামবার্ড–এর ডুবুজাহাজ নিয়ে। জলদস্যু হামবার্ড এ জাহাজখানা কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মাণ করেছিলো। লোকচক্ষুর অন্তরালে তাকে এই জাহাজ তৈরির কাজ সমাধা করতে হয়েছিলো।

মিঃ মাংসুর উদ্দেশ্য তার রায়হান আস্তানায় পৌঁছে জাভেদকে সেখানে আটক করে রাখবে এবং তাকে দিয়ে অনেক অসাধ্য কাজ সমাধা করাবে।

যে উদ্দেশ্য নিয়ে জ্যোতিষী সন্ন্যাসী জাভেদকে ওষুধ খাইয়েছিল, যে উদ্দেশ্য নিয়ে বিদেশী শিকারিগণ জাভেদকে আটক করে খাঁচায় আবদ্ধ করেছিলো, সেই

ধরনের উদ্দেশ্য নিয়েই মিঃ মাংসু জাভেদকে হসপিটালের বেড থেকে সরিয়ে এনেছে। শেষ চেষ্টা সে করবে।

মিঃ মাংসু যখন নিশ্চিন্ত তখন বনহুর পরে নিলো ডুবুরীর ড্রেস।

হামবার্ডের জাহাজে এসব কিছুর অভাব ছিলো না। ডুবুরীর ড্রেস এবং অক্সিজেন বক্স, টিউব পাইপ, সাউন্ড বক্স এবং ক্যামেরা যা সাগরতলে ছবি তোলার জন্য প্রয়োজন সব আছে এ জাহাজে।

বনহুর ডুবুজাহাজ থেকে আর বেশি দূরে নয় মিঃ মাংসুর জাহাজখানা। বনহুর ঐ জাহাজটি লক্ষ করে এগুতে লাগলো।

সঙ্গে সূতীক্ষ্ণধার ছোরা।

মাথায় বাঁধা রয়েছে ক্যামেরা।

সাগরতলে যা দৃষ্টিগোচর হচ্ছে সব ডুবু জাহাজের টেলিভিশন পর্দায় পরিলক্ষিত হচ্ছে। চালকদ্বয় এ সব দৃশ্য ভালভাবে লক্ষ করছে।

হামবার্ড তার জাহাজে প্রচুর খাদ্য ও পানীয় মজুত রেখেছে এবং নানা ধরনের অস্ত্র ও ছিলো।

বনহুর সূতীক্ষ্ণধার ছোরা এবং ডুবুরী ড্রেসের পকেটে ভরে নিয়েছিলো পিস্তল এবং দূরবীক্ষণ যন্ত্র। সাগরের গভীর অতলে হঠাৎ প্রয়োজনবোধে যেন ওগুলো ব্যবহার করা সম্ভব হয়।

ডুবুরী ড্রেসগুলো এমন ছিলো যার অভ্যন্তরে পানি প্রবেশ সম্ভব ছিলো না। তাই বনহুর বিনা দ্বিধায় এসব অস্ত্র সঙ্গে নিতে পারলো।

মাঝে মাঝে দূরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা চলন্ত এবং ভাসমান জাহাজখানাকে লক্ষ করছিলো। আজ বনহুর যখন জাহাজ থেকে প্রশান্ত মহাসাগর বক্ষে নেমে আসে তখন কেউ তাকে বারণ করেনি, যদি ইলোরা থাকতো নিশ্চয়ই সে বাধা দিতে হয়তো বা ভাবতো আর যদি সে ফিরে না আসে। ইলোরার চোখ দুটো অশ্রুসজল হতো।

বনহুর সাগরতল দিয়ে এগিয়ে চলেছে।

ওদিকে নিকটবর্তী হচ্ছে মিঃ মাংসুর জাহাজখানা।

ডুবু জাহাজের চালকদ্বয় শপথ করেছে আর তারা বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। এতে তাদের বিপদ আসতে পারে। তাদের একজনের নির্মম মৃত্যু এই শিক্ষাই দিয়েছে তারা আর এমন কুচিন্তা করবে না।

চালকদ্বয়ের সম্মুখে যে টেলিভিশন পর্দা রয়েছে তাতেই সাগরতলের দৃশ্যগুলো প্রতিফলিত হচ্ছে যা বনহুরের সঙ্গের ক্যামেরা গ্রহণ করছিলো।

বনহুর এগিয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ তার সম্মুখে এগিয়ে আসে বিরাট একটি হাঙ্গর। বনহুর দ্রুত সূতীক্ষ্ণধার ছোরাখানা তুলে ধরলো।

হাঙ্গরটি তার দিকে হা করে এগিয়ে আসছে।

বনহুর কৌশলে ছোরাখানা হাঙ্গরটির পেটে বসিয়ে দিয়ে টেনে তুলে নিলো। সঙ্গে সঙ্গে হু হু করে বেরিয়ে এলো তাজা লাল রক্ত। সাগরের তলদেশে তবু খানিকটা পানি লালে লাল হয়ে উঠলো।

যন্ত্রণায় হাঙ্গরটা চীৎ হয়ে একবার উল্টে গেলো। তারপর আবার খানিকটা এগিয়ে গেলো সম্মুখে। ততক্ষণে বনহুর হাঙ্গরটার নিকট হতে সরে গেছে অনেক দূরে।

*

মিঃ মাংসু এসে বসলো জাভেদের পাশে।

জাভেদ তার শয্যায় দু হাঁটুর মধ্যে মাথা রেখে বসেছিলো।

মাংসুর পদশব্দে মুখ তুলে তাকালো জাভেদ।

মিঃ মাংসু একটা আসনে গা এলিয়ে দিয়ে বসলো, বললো–যুবক, তোমার নাম এখনও জানতে পারিনি। কি তোমার পরিচয়?

জাভেদ শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে, কোনো জবাব সে দেয় না, হয়তো ভাবে ঐ লোকটাই বা কে যাকে সে দেখতে পাচ্ছে। তার পরিচয়ও তো সে জানে না। তাকে কেনই বা আনা হলো এ জাহাজে তাও জাভেদ বুঝতে পারেনি। হসপিটালের বেড থেকে সে কিভাবে জাহাজে এসেছে তাও সে অনুধাবন করতে পারেনি এখনও।

কিই বা বলবে জাভেদ।

মিঃ মাংসু জাভেদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবে তরুণটি কে, সে নিজেই জানে না। বহুদিন বনে বনে বিচরণ করায় তার মানসিক ভারসাম্য লুপ্ত হয়েছে। তবে তার দৈহিক শক্তি সীমাহীন একটা পত্র–পত্রিকায় পড়েছে এবং তরুণটির বিষয় অবগত হয়েছে সে। কারণ তাকে বহু চেষ্টা করেও কেউ আটক করতে পারতো না। একা সে বিশ পঁচিশ জন জোয়ারকে কাবু করে সরে পড়েছে। অনেক সময় পথচারিগণ দেখেছে তরুণটি হিংস্র বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করছে, কোনো সময় বা লড়াই করছে বন্য মহিষের সঙ্গে, কোনো সময় সিংহের সঙ্গে।

মিঃ মাংসু এসব জানার পর নিশ্চুপ থাকতে পারেনি। এমনি একটি লোকেরই প্রয়োজন আছে তার। মিঃ মাংসুর আশা পূর্ণ হয়েছে, এখন বাসনা চরিতার্থ হলেই হয়।

আশায় আনন্দে কুচক্রী মিঃ মাংসুর চোখ দুটো জ্বলছিলো জ্বলজ্বল করে।

বললো সে–যুবক, তোমাকে আমি রাজা বানাবো। যা চাও তাই পাবে।

জাভেদ তবু নীরব।

মিঃ মাংসু এবার ক্রুদ্ধভাবে বললো–আমার কথা তুমি শুনতে পাচ্ছো না?

তবু জাভেদ নিশ্চুপ।

মিঃ মাংসু কলিং বেল টিপলো।

দুজন বলিষ্ঠ লোক প্রবেশ করলো সেই ক্যাবিনে।

বললো মিঃ মাংসু–তোমরা ওর কাছ থেকে কথা আদায় করে নাও। আমি কোনো রকমে ওকে কিছু বলতে পারলাম না। হয়তো ও আমাদের বোকা বানাতে চেষ্টা করছে.......যাও চাবুক নিয়ে এসো।

মালিকের হুকুম পেয়ে চলে গেলো একজন, একটু পর ফিরে এলো হাতে তার কালো চকচকে চাবুক।

বললো মিঃ মাংসু–লাগাও, নাহলে ও কথা বলবে না।

এবার চাবুক হাতে লোকটা সরে এলো জাভেদের বিছানার পাশে। দক্ষিণ হাতে শক্ত করে ধরলো চাবুকখানা।

মিঃ মাংসু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাকালো জাভেদের দিকে।

জাভেদ পূর্বের মত নির্বাক।

সে যেমন বসে ছিলো তেমনি রইলো।

মিঃ মাংসুর মুখমন্ডলে ক্রুদ্ধ ভাব ফুটে উঠলো, সে দাতে দাঁত পিষে বললো–চাবুক লাগাও।

তৎক্ষণাৎ অনুচরটি তার হস্তস্থিত চাবুকখানা তুলে সপাং করে বসিয়ে দিলো জাভেদের দেহে। পর পর তিন চারবার আঘাত করতেই জাভেদ গর্জে উঠলো, একটা হুংকার ছেড়ে লাফিয়ে পড়লো অনুচরটির ওপর।

হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলো অনুচরটি।

জাভেদ ওর ঘাড় ধরে টেনে তুললো। তারপর প্রচন্ড এক ঘুষি বসিয়ে দিলো তার নাকে। সঙ্গে সঙ্গে রক্ত গড়িয়ে পড়লো নাক বেয়ে। আবার সে হুমড়ি খেয়ে পড়লো।

চাবুকখানা এখনও তার হাতের মুঠায়।

এবার জাভেদ ওর হাত থেকে চাবুকখানা টেনে নিয়ে সপাং সপাং করে কয়েক ঘা বসিয়ে দিলো তারপর চাবুকখানা ছুঁড়ে সাগরবক্ষে ফেলে দিয়ে হাতের ওপর তুলে নিলো অনুচরটিকে, তারপর তাকেও ছুঁড়ে দিলো সাগরের গভীর জলে।

প্রকান্ড প্রকান্ড ঢেউগুলো আছাড় খেয়ে পড়ছে জাহাজের গায়ে। অনুচরটির দেহ সেই প্রকান্ড এবং প্রচন্ড ঢেউয়ের অতলে তলিয়ে গেলো।

মাংসু হতভম্ব স্তম্ভিত।

সে ভাবতে পারেনি এমন একটা অবস্থা হবে। ভীষণ ভড়কে গেলো। মাংসু দ্রুত বেরিয়ে গেলো, ভয় হলো তাকে যদি আক্রমণ করে বসে।

মিঃ মাংসু তার নিজের ক্যাবিনে প্রবেশ করে তার নিজস্ব চাবুকখানা তুলে নিলো হাতে এবং পুনরায় জাভেদের ক্যাবিনে প্রবেশ করতে যাবে এমন সময় যমদূতের মত সম্মুখে দেখতে পেলো জাভেদকে।

মুহূর্তে তার চোখের সামনে ভেসে উঠলো একটি মুখ, সেই মুখখানার সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে এই মুখখানা যেন। সে মুখখানা দস্যু বনহুরের। একদিন মাংসু নির্মমভাবে আক্রান্ত হয়েছিলো বনহুরের হাতে। সেদিন ভাগ্যক্রমে রেহাই পেয়েছিলো, পালিয়ে গিয়ে প্রাণ রক্ষা পেয়েছিলো সেদিন।

কিন্তু এ দন্ডে ভাববার সময় নেই।

জাভেদ মিঃ মাংসুকে সম্মুখে দেখে হুংকার ছাড়লো, ভীষণ আর ভয়ংকর কণ্ঠে বললো–আবার যদি এখানে আসবে তোমার অবস্থাও ওর মত হবে……জাভেদ আংগুল দিয়ে সাগরবক্ষ দেখিয়ে দিলো।

মিঃ মাংসু বুঝতে পারলো ও এখন স্বাভাবিক নয়, কাজেই ওর কাছে যাওয়া মানে মৃত্যুবরণ করা। তাড়াতাড়ি সরে এলো মাংসু। এসে সে তার অনুচরদের বললো–তোমরা প্রস্তুত থাকো, ওকে মজবুত করে বেঁধে তারপর সায়েস্তা করতে হবে।

অনুচরগণ মালিকের কথায় প্রস্তুত হয়ে নিলো। শিকল আর মজবুত দড়ি বেঁধে তাকে বশ্যতা স্বীকার করাতে হবে। তার ওপর চালাতে হবে নির্মম অত্যাচার। যে অত্যাচার সহ্য করতে গিয়ে সে কাবু হয়ে পড়বে, বশ্যতা স্বীকার করবে তাদের কাছে।

মিঃ মাংসু লক্ষ রাখলো কখন জাভেদ ঘুমাবে। তখন তাকে শংঙ্খলাবদ্ধ করা হবে।

ওদিকে এগিয়ে আসছে বনহুর। তাকে মাঝে মাঝে সাগরতলে জলজীবের সঙ্গে লড়াই করতে হচ্ছে।

সুইচ টিপে ডুবু জাহাজের চালকদ্বয় আলোকরশ্মি ছড়িয়ে দিচ্ছে সাগরদলে। যে আলোকরশ্মি একদিন মণীষা দ্বীপবাসী মণীষা সাগরবক্ষে বেড়াজালের মত এদিক ওদিক ছুটাছুটি করতে দেখেছিলো এবং সেই আলোকরশ্মি নিয়ে মণীষা পুলিশমহল ভীষণ ভাবনায় পড়ে গিয়েছিলো এমনকি আহাদ ও রাণীও এই আলোর খেলা সাগরবক্ষে দেখেছিলো। আর সেই আলোক রশ্মির রহস্য উদঘাটন করতে গিয়েই রাণী আর চন্দনা শিকার হয়েছিলো কুচক্রীদের।

সেদিন বনহুর যদি ঠিকভাবে এসে না পৌঁছতো তাহলে রাণী আর চন্দনাকে উদ্ধার করা মোটেই সম্ভব হতো না বনহুরের পক্ষে। তবে ইলোরার বুদ্ধিমত্তাই বেশি কাজ করেছিলো সেদিন। নইলে রাণী আর চন্দনার সঙ্গে বনহুর নিজেও মারা পড়তো সূতীক্ষ্ণ ধার ছোরাবিদ্ধ হয়ে দেয়ালের চাপে।

বনহুর যখন সাগরতল দিয়ে এগিয়ে আসছে তখন ডুবু জাহাজের চালকদ্বয় তাকে পথের নির্দেশ দিচ্ছিলো সাগরতলে আলোকরশ্মি ফেলে। যে আলোকরশ্মির ছটা সাগরের গাঢ় নীল পানি ভেদ করে পথ সচ্ছ করে দিচ্ছিলো।

বনহুর মিঃ মাংসুর জাহাজখানাকে দেখতে পাচ্ছে না, কারণ জাহাজখানা ছিলো পানির উপরে ভাসমান। ডুবু জাহাজের চালকদ্বয় তাদের জাহাজ হতে মিঃ মাংসুর জাহাজখানা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সম্মুখ পর্দায় এবং তারা ডুবু জাহাজ থেকে বিচ্ছুরিতভাবে আলোকরশ্মি ফেলে বনহুরকে পথের নির্দেশ দিচ্ছিলো।

এগিয়ে যাচ্ছে বনহুর।

তার হাতে সূতীক্ষ্ণধার ছোরা, ছোরা দিয়ে সে হাঙ্গরের কবল থেকে রক্ষা পেয়েছে।

এবার বনহুর মাংসুর জাহাজখানার কাছাকাছি এসে পড়েছে। বনহুর এবার জাহাজের চাকাগুলোর দাঁত দেখতে পাচ্ছে। ভীষণ আর ভয়ংকর ঐ চাকাগুলো। কোনোক্রমে একবার ঐ চাকার নিকটে পৌঁছলে আর রক্ষা নেই, ঘূর্ণীয়মান জলরাশি আকর্ষণ করবে এবং চাকার দাঁতে পিষ্ট হয়ে মৃত্যুবরণ করতে হবে।

বনহুর অত্যন্ত সজাগভাবে জাহাজখানার দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

এ দিকে ডুবু জাহাজখানা মিঃ মাংসুর জাহাজের প্রায় তলদেশে এসে গেছে। বনহুর জাহাজখানার দিকে অতি সাবধানে এগিয়ে যাচ্ছে।

সত্যি এ দৃশ্য অতি ভয়ংকর। এখন আলোকরশ্মি অতি সাবধানে পথের নির্দেশ দিচ্ছে কারণ আলোকরশ্মি ওদের নজরে এসে গেলে ওরা সাবধান হয়ে পড়বে, নচেৎ কোনো কৌশল অবলম্বন করবে তখন বনহুরের পক্ষে ঐ জাহাজখানায় পৌঁছানো মুস্কিল হয়ে পড়বে।

বনহুর যখন জাহাজের ঠিক কাছাকাছি এসে পড়েছে তখন মিঃ মাংসু তার কয়েকজন অনুচরগসহ জাভেদকে মজবুত করে বেঁধে ফেললো। তারপর চাবুকখানা তুলে নিলো মাংসু হাতে।

দাতে দাঁত পিষে বললো–আমার অনুচরটিকে তুমি সাগরবক্ষে নিক্ষেপ করেছে। আমি তোমাকে এই মুহূর্তে হত্যা করতে পারতাম কিন্তু করবো না, কারণ তোমাকে আমার দরকার আছে। কথাটা বলে মিঃ মাংসু হস্তস্থিত চাবুকখানা শক্ত করে ধরলো।

দু হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে বসেছিলো জাভেদ। মিঃ মাংসুর কথায় মুখ তুলে তাকালো সে।

মিঃ মাংসুর মুখে ক্রুদ্ধ আর হিংস্র ভাব।

দুচোখ দিয়ে আগুন ঠিকরে বের হচ্ছে। দাঁত পিষে আবার বললো মাংসু–এবার তোতমার পিঠের চামড়া তুলে নেবো, তোমার দেহ দিয়ে রক্ত ঝরাবো।

জাভেদ তেমনি নিরুত্তর।

মিঃ মাংসুর চাবুক এসে পড়লো জাভেদের পিঠে। তার রাগ শুধু কথা না বলাই নয়, তার বিশ্বস্ত অনুচরটিকে সাগরবক্ষে নিক্ষেপ করে হত্যা করেছে জাভেদ।

জাভেদকে শায়েস্তা করাই তার মূল উদ্দেশ্য এবং তাকে দিয়ে যদি কাজ সমাধা না হয় তাহলে তাকে হত্যা করতেও দ্বিধা নেই মাংসুর এবং এখন সে ঐ ধরনের উদ্দেশ্য নিয়েই হাজির হয়েছে। মাংসুর সঙ্গে রয়েছে আরও কয়েকজন অনুচর কারণ ওর সঙ্গে মাংসু পেরে উঠতে পারবে না, তখন যেন এরা মাংসুকে রক্ষা করতে পারে। ওদের প্রত্যেকের হাতে মারাত্মক আগ্নেয়াস্ত্র রয়েছে।

মিঃ মাংসুর হস্তস্থিত চাবুকখানা আবার গিয়ে পড়লো জাভেদের পিঠে।

এবার জাভেদ ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় গর্জে উঠলো এবং মিঃ মাংসুকে আক্রমণ করতে গেলো।

সঙ্গে সঙ্গে ঘিরে ফেললো মাংসুর অনুচরগণ জাভেদকে। আগ্নেয়াস্ত্র উদ্যত করে ধরলো সবাই।

মাংসু পুনরায় কষাঘাত করলো।

এবার জাভেদের দেহের চামড়া কেটে উঠে এলো চাবুকের সঙ্গে, রক্ত গড়িয়ে পড়লো তার দেহ থেকে। জাভেদের চোখ দুটো অন্ধ করে দেবার জন্য গরম লোহার শলাকা নিয়ে আসা হলো।

মিঃ মাংসু লোহার শলাকা দুটো দুহাতে তুলে নিলো। এবার সে জাভেদকে একটা থামের সঙ্গে বেঁধে ফেলার জন্য অনুচরদের প্রতি ইংগিত করলো।

অনুচরগণ মজবুত করে বাঁধার জন্য ওকে ধরলো। ওর শরীরের চামড়া কেটে রক্ত ঝরছে।

জাভেদ নিশ্চুপ রইলো, উপায় নেই। কারণ ওদের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র রয়েছে যদিও যন্ত্রণায় মুখমন্ডল তার বিকৃত। ওকে বেঁধে ফেলা হলো ভালভাবে।

এবার মিঃ মাংসু লোহার শিক জাভেদের চোখে বিদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে নিলো।

আর অল্পক্ষণ মাত্র, জাভেদের দুচোখ অন্ধ হয়ে যাবে তারপর তাকে সাগরবক্ষে নিক্ষেপ করা হবে। এ কদিনে তাকে বশে আনার অনেক চেষ্টা করা হচ্ছিলো কিন্তু কিছুতেই জাভেদকে আয়ত্তে আনা সম্ভব হয়নি। মিঃ মাংসু এবারের সাগরযাত্রার মূল উদ্দেশ্য অজানা অচেনা শক্তিশালী তরুণটিকে নিজের বশে আনা এবং পুলিশমহল ও হিন্দোলবাসীদের দৃষ্টির অন্তরালে সরিয়ে আনা। উদ্দেশ্য সফল না হওয়ায় মাংসু ভীষণ ক্ষেপে উঠেছে। শুধু পরিশ্রমই তার বিনষ্ট হয়নি, হয়েছে বহু অর্থ ব্যয়।

মিঃ মাংসুর তাই রাগের অন্ত নেই।

ভীষণ ক্ষেপেছে সে।

ওকে এখন হত্যা করতেও কোনো দ্বিধা নেই তার।

মাংসুর চেহারা পিচাশের চেয়েও ভয়ংকর লাগছে এই মুহূর্তে।

জাভেদ নিশ্চুপ।

তার হাত দুখানা দুপাশে লম্বা করে বাঁধা হয়েছে। দেহটা থামের সঙ্গে বাঁধা মজুত করে।

একচুল যেন সে নড়তে না পারে।

মিঃ মাংসু লোহার শিক দুটো উঁচু করে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছিলো জাভেদের দিকে, ঐ মুহূর্তে পেছন থেকে মিঃ মাংসুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো বনহুর।

জাহাজখানার উপরে উঠে এসে যখন খোঁজ করলো বনহুর জাভেদ কোন ক্যাবিনে আছে তখন হতাশ হলো সে। জাহাজখানার প্রায় ক্যাবিনই খালি।

অবশ্য বনহুর ক্যাবিনগুলোকে খালি দেখার কারণ ছিলো। জাহাজের নাবিকগণ ছাড়া সবাই প্রায় জাভেদের ক্যাবিনে এ মুহূর্তে হাজির হয়েছে। তারা সবাই মিলে দেখতে চায় তরুণটিকে কিভাবে অন্ধ করা হয়, তারপর কিভাবে তাকে হত্যা করা হবে।

মিঃ মাংসুর অনুচরদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ রয়েছে এ ব্যাপারে, তাই তারা জাভেদের ক্যাবিনে সমবেত হয়েছে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য।

বনহুর যখন মিঃ মাংসুর জাহাজের ভয়ংকর দাঁতগুলোর আকর্ষণ উপেক্ষা করে অতি সর্তকতার সঙ্গে জাহাজের গায়ের বানার একটি ধরে ফেললো তখন দেহ ছিলো ডুবুরীর ড্রেসে আচ্ছাদিত। পিঠে ছিলো অক্সিজেন বক্স এবং ক্যামেরা ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি।

মিঃ মাংসুর জাহাজে উঠে আসার পর সে দেহের ড্রেস খুলে রাখলো এক পাশে। আড়ালে যেন চট করে কারো নজরে না পড়ে।

বনহুর সূতীক্ষ্ণধার ছোরাখানা দক্ষিণ হাতে এঁটে ধীরে অগ্রসর হলো। চারদিকে ছিলো তার সূতীক্ষ্ণ দৃষ্টি, যেন কেউ তাকে আড়াল থেকে আক্রমণ চালাতে না পারে। বিস্ময়কর জাহাজখানা–যেমন বাইরের আবরণ তেমনি ভিতরটাও।

অবাক না হয়ে পারেনি বনহুর।

কোনো ক্যাবিনে কেউ ছিলো না।

সব ক্যাবিনগুলো আশ্চর্য ধরনের। কেমন যেন অদ্ভুত লাগছে বনহুরের কাছে। হঠাৎ তার কানে গেলো একটি কণ্ঠস্বর–শক্ত করে বেঁধে ফেলল, একচুল যেন ও নড়তে না পারে........

বনহুর একটা ক্যাবিনের আড়ালে আত্মগোপন করে দেখতে লাগলো। প্রথম দৃষ্টি পড়তেই চমকে উঠলো বনহুর, জাভেদকে তারা একটা থামের সঙ্গে শক্ত করে বাধছে। বনহুর অপেক্ষা করে দেখছে ওরা জাভেদকে বেঁধে তারপর কি করে।

মিঃ মাংসুর হাতে যখন গরম লোহার শলাকা দেখতে পেলো তখন বনহুরের বুঝতে বাকি রইলো না, কি কারণে জাভেদকে এভাবে মজবুত করে বাঁধা হয়েছে। সে প্রস্তুত হয়ে নিলো, জাভেদকে উদ্ধার করতেই হবে।

মিঃ মাংসু যখন শলাকা দুটি হাতে নিয়ে জাভেদের দিকে অগ্রসর হলো ঠিক ঐ মুহূর্তে বনহুর আঁপিয়ে পড়লো তার ওপর।

সঙ্গে সঙ্গে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলো মিঃ মাংসু এবং তার সঙ্গে বনহুরও পড়ে গেলো কারণ টাল সামলাতে পারেনি ওরা দুজনই।

বনহুর উঠে দাঁড়াবার পূর্বেই মিঃ মাংসুর অনুচরগণ আগ্নেয়াস্ত্র উদ্যত করে ধরলো।

উঠে দাঁড়ালো বনহুর এবং মিঃ মাংসুও সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ে হাত দুখানা মুষ্টি বদ্ধ করলো। বনহুর তাকিয়ে দেখলো তার চারপাশে বেষ্ঠন করে দাঁড়িয়েছে মিঃ মাংসুর অনুচরগণ। ওদিকে জাভেদের দু পাশে দুজন অস্ত্রধারী সজাগ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

বনহুর হাতের সূতীক্ষ্ণধার ছোরা ফেলে দিলো। সে বুঝতে পারলো এই মুহূর্তে তার কোনো শক্তিই কাজে লাগবে না, কারণ জাভেদকে তার উদ্ধার করতেই হবে; নইলে তার এ প্রচেষ্টা সব ব্যর্থ হয়ে যাবে। বনহুর হাত দুখানা বাড়িয়ে দিলো ওদের দিকে।

মিঃ মাংসু প্রথম দর্শনেই চিনতে পারলো বনহুকে। প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে হঠাৎ ওর আবির্ভাব যদিও তাকে এই মুহূর্তে বিস্মিত করে তুলেছিলো তাবুও একেবারে স্তম্ভিত হয়নি, কারণ মাংসু জানতো বনহুরের অসাধ্য কিছু নেই। মাংসু তাই হকচকিয়ে না গিয়ে নিজকে শক্ত করে নিলো এবং নিজে তার একটি অনুচরের হাত হতে রিভলভার দ্রুত টেনে নিয়ে বনহুরের বুক লক্ষ্য করে উদ্যত করলো। অনুচরদের লক্ষ্য করে ইংগিত করলো বনহুরকে বেঁধে ফেলার জন্য।

মিঃ মাংসুর আদেশমত বনহুরকে ওরা বেঁধে ফেললো।

বনহুর একটুও বাধা দিলো না।

নিশ্চুপ সে হাত দুখানা বাড়িয়ে দিয়েছিলো ওদের দিকে।

মিঃ মাংসুর মুখে একটা পৈশাচিক হাসি ফুটে উঠলো। তাকালো সে জাভেদের দিকে, জাভেদ পূর্বের মতই চুপচাপ ছিলো।

বনহুর মাংসুকে লক্ষ্য করে বললো–তোমরা ওর কোনো ক্ষতি করো না। আমি তোমার ক্ষতি করবো না।

সত্যি বলছো?

হাঁ।

কিন্তু তুমি আমাকে দেশত্যাগী করেছে। আমি আজ দূরে বহুদূরে চলে এসেছি....

বললো বনহুর–তুমি বহুদুরে পালাতে চাইলেও আমি জানতাম তোমার সন্ধান! জেনেও তোমাকে কিছু বলিনি......তুমি যে কাজ করছে তা সভ্যসমাজের মেরুদন্ড ভেঙে ফেলছে। তোমার কুকর্ম আমার অজানা নেই তবু জেনেও আমি তোমাকে ক্ষমা করেছি।

এখন তুমি আমার বন্দী।

হাঁ, একথা আমি অস্বীকার করতে চাই না।

তোমাকে আমি এই মুহূর্তে হত্যা করতে পারি।

জানি। কিন্তু করবেনা তাও জানি। একটু হাসলো বনহুর।

মিঃ মাংসু বললো–হত্যা করবো না এই মুহূর্তে, কারণ তোমাকে শায়েস্তা করাই আমার ইচ্ছা এবং তিল তিল করে তোমাকে মারবো। বলো বনহুর–ঐ ছেলেটি কে? ওর সঙ্গে তোমার কি সম্বন্ধ?

খুব কঠিন প্রশ্ন করেছে মাংসু।

আমি জানি ওর সঙ্গে তোমার কোনো সম্বন্ধ রয়েছে।

কারণ?

কারণ ওর চেহারার মধ্যে রয়েছে তোমার প্রতিচ্ছবি।

মাংসু।

হাঁ, তুমি অস্বীকার করতে পারবে না। ওর চেহারা স্মরণ করিয়ে দেয় তোমাকে।

তাহলে তুমি যা অনুমান করো তাই সত্য।

বনহুর, আমি জানতাম তুমি সৎ চরিত্র কিন্তু.....

বল থামলে কেন?

কোন নারীর গর্ভে ওর জন্য বলতে লজ্জা বা দ্বিধাবোধ করবো না তো? শুনেছিলাম তুমি নারীজাতিকে অধিক সম্মান দাও..

মাংসু, তোমার কথা হেঁয়ালিপূর্ণ, কাজেই আরও স্পষ্ট করে বলল কি বলতে চাও তুমি?

এখনও বুঝতে পারোনি? তুমি নাকি সৎ–চরিত্র তবে ওর জন্য কিভাবে হলো? ওর মাকে তুমি……মানে একটা মেয়ের ইজ্জত নষ্ট করে…….

এ মুহূর্তে আমার হাত যদি বন্ধনমুক্ত থাকতো তাহলে তুমি রেহাই পেতে না মাংসু। ও আমার সন্তান এবং আমার স্ত্রীর গর্তে ওর জন্ম।

তাই নাকি!

বেশিকিছু জানতে চেও না মাংসু।

মাংসু এবার অনুচরদের বললো–ওকে পৃথক ক্যাবিনে নিয়ে যাও এবং ভালভাবে বেঁধে রেখে দাও। মাংসু চলে গেলো।

অনুচরগণ বনহুরকে নিয়ে চলে গেলো পাশের ক্যাবিনে।

যদিও জাহাজখানা বাইরে থেকে কোনো একটা জলজীবের মত দেখায় কিন্তু জাহাজখানার অভ্যন্তরে ঠিক জাহাজের মতই।

বনহুরকে পৃথক এক ক্যাবিনে আটকে রাখা হলো।

বুঝতে পারলো বনহুর কুচক্রীর কবলে সে আটকা পড়লো, আর তার সহজে ফসকে যাবার উপায় নেই।

*

রাণীর মন বিষণ্ন।

সেদিনের কথা রাণী কিছুতেই ভুলতে পারছে না। সে কি ভয়ংকর মুহূর্ত। সেই ভীষণ গর্জন আর বিস্ফোরণ।

রাণী আর চন্দনা সব কথা আহাদ চৌধুরীকে বলেছিলো। সেই মারণাস্ত্র তৈরির ঘাঁটি, বিস্ময়কর কলকারখানা আর মেশিনপত্র ভূগর্ভে এ ধরনের কারখানা সত্যি আশ্চর্যজনক বটে। বনহুর তাদের দুজনকে উদ্ধার করতে গিয়ে নিজেও মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে যাচ্ছিলো। ভাগ্যিস এক তরুণী তাদের উদ্ধার করেছিলো নিজের জীবন বিসর্জন দিয়ে। কে সে তরুণী জানেনা রাণী বা চন্দনা কিন্তু তরুণীর মৃত্যু বনহুরকে অত্যন্ত কাতর করে তুলেছিলো তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

বনহুর তাদেরকে ভূগর্ভ হতে উদ্ধার করে এনেছিলো বটে কিন্তু সে আবার বিদায় নিয়ে চলে গিয়েছিলো। তারপর প্রচন্ড বিস্ফোরণ, প্রচন্ড অগ্নিশিক্ষা...... কে জানে সে জীবিত আছে না নিঃশেষ হয়ে গেছে।

কদিন সব সময় রাণী এ একই চিন্তা করে চলেছে। মিঃ আহাদ চৌধুরী অনেক বুঝিয়েছে রাণীকে, ওর জন্য ভেবোনা রাণী, ভেবে কোনো ফল হবে না, কারণ যে সবার ভাবনা চিন্তার উদ্ধে। যদি সে মৃত্যুবরণ করে থাকে তাতে দুঃখ পাবার কিছু নেই, কারণ মণীষা দ্বীপের অগণিত মানুষের জীবন রক্ষা পেয়েছে মারণাস্ত্র তৈরির ঘাঁটি ধ্বংস। নিজ জীবন দিয়ে বনহুর মণীষা দ্বীপের রহস্য সমাধান করে দিয়ে গেছে।

মিঃ আহাদ চৌধুরীর সান্ত্বনা বাক্য রাণী ও চন্দনাকে আশ্বস্ত করতে পারে না।

মণীষার রহস্য উদঘাটিত হয়েছে।

অহেতুক সময় নষ্ট করা সমীচীন নয়। এখানে বসে বনহুরকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। মিঃ আহাদ চৌধুরী মণীষা পুলিশবাহিনীসহ ভূগর্ভ মারণাস্ত্র তৈরি ঘাঁটিতে সন্ধান চালিয়ে কোনো হদিস পাননি বনহুরের।

রাণী চন্দনা সহ মিঃ আহাদ এবং পুলিশবাহিনীর সঙ্গে ভূগর্ভে প্রবেশের চেষ্টা করেছিলো কিন্তু সক্ষম হয়নি, সেখানে এখনও বিস্ফোরণ ঘটছে, মাঝে–মধ্যেই ভেসে আসছে প্রচন্ড শব্দ।

পুলিশমহলে ডি, আই, বি এবং সাংবাদিকগণ এসব সংবাদ সংগ্রহ করে চলেছে। হাজার হাজার মানুষ দূর থেকে ভীড় জমিয়ে দেখছে।

এমন কি বিদেশী সাংবাদিকগণ সংবাদ সংগ্রহ করছেন তার সঙ্গে সংগ্রহ করছেন বিক্ষোরণের দৃশ্য। নানা ভাবে ছবি নিচ্ছেন তারা।

মণীষা দ্বীপ লোকে লোকারণ্য।

জাহাজভর্তি লোক আসছে এই সংবাদ পেয়ে, তারা প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে দেখতে চায়। তারা কোনোদিন এমন ঘটনার কথা শোনেনি বা দেখেওনি।

মিঃ আহাদ চৌধুরী আর চন্দনার সাক্ষাৎকার নিচ্ছেন তারা অহরহ, এমন কি ছবিও নিচ্ছেন।

অবশ্য রাণী নিজের ছবি দিতে রাজি ছিলো না, কারণ তার আরও একটা গোপন পরিচয়। আছে।

মণীষা দ্বীপবাসীদের মনে আনন্দ উৎসব বয়ে চলেছে। তারা আজ অনেকটা নিশ্চিন্ত হতে পেরেছে। অনিশ্চিত মৃত্যুর ছোবল থেকে তারা রক্ষা পেলো এটাই তাদের ধারণা। অবশ্য ধারণাটা মিথ্যে নয়, কারণ প্রশান্ত মহাসাগরের বৃহদাকার শাখা মণীষা সাগর আর ঐ সাগরের মধ্যে হতেই মহাকাল রাক্ষসীর করাল থাবা গ্রাস করে তাদের জনজীবন। শুধু একবার বা দুবার নয় বহুবার তারা হারিয়েছে আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, ধনসম্পদ এবং আশ্রয়স্থল।

আজ মণীষাবাসীরা সর্বহারা।

তবু তাদের মনে ভরসা আর তারা অকালে মৃত্যুবরণ করবে না আর তারা স্ত্রী–পুত্র–সন্তান হারাবে না। হারাবে না মাথা গুজবার ঠাইটুকু।

রাণী রহমতকে পাঠিয়ে আস্তানা হতে এনেছে বহু অর্থ এবং নিজের হাতে সে বিলিয়ে দিয়েছে মণীষাবাসীদের মধ্যে। যারা আহত তাদের করেছে সেবাযত্ন, যেমন করে নার্সরা সেবা করে রোগীদের।

সবার মনে বিস্ময়।

কে এই নারী যার বুকভরা দয়ামায়া আর ভালবাসা।

চন্দনা রাণীকে সাহায্য করে। তবে মাঝে মাঝে হাঁপিয়ে পড়ে সে, বলে–দিনরাত এমনি করে রোগীদের নিয়ে কাটাবে? নিজের দিকে ফিরে তাকাবে না একবার?

হেসে জবাব দিয়েছে রাণী–ওদের মধ্যেই যে আমি নিজকে খুঁজে পাই চন্দনা।

জানো মিঃ চৌধুরীর দিনগুলো কেমনভাবে কাটছে?

জানি। তুই আছিস বলে আমি ওর ব্যাপারে নিশ্চিন্ত।

কিন্তু অতটা নিশ্চিন্ত হওয়া ভাল নয়।

রাণী একটি রোগীর সেবা নিয়ে ব্যস্ত ছিলো, চন্দনার কথায় চোখ তুলে বললো–কেন?

শেষে যদি তোমার অমূল্য সম্পদ আমি হরণ করে নেই?

হেসে বললো রাণী–সে ভয়ে ভীত নয় রাণী। হরণ করলেও হজম করতে পারবি না।

কারণ?

কারণ আজ আর নয় বলবো আর একদিন।

সত্যি যাবে না রাণী?

না।

তবে আমাকে বিদায় দাও, বড় ক্লান্ত আমি।

ও? মিঃ চৌধুরীর পাশে যাবার জন্য মন বুঝি ছটফট করছে।

তুমি যখন যাবে না তখন আমিও যদি তার প্রতি অবহেলা দেখাই তাহলে বেচারার অবস্থা। একবার চিন্তা করো।

যা, তোর ছুটি।

তুমি কখন ফিরবে? না, এই হসপিটালেই থেকে যাবে।

তাবুতে আর ফিরতে ইচ্ছে করে না।

তার মানে?

জানি না।

রাণী, তোমাকে আজও চিনলাম না।

তুই কেন, আজ পর্যন্ত আমাকে কে চিনলো বলতো?

রাণী।

সত্যি ভাল লাগে না চন্দনা। চারদিকে অসহায় মানুষের কান্না আর বিলাপ......

রাণী, আমি সেই প্রথম থেকে তোমার সঙ্গে আছি। তোমার কি একটুও পরিবর্তন হবে না? তোমার কি মনে পড়ছে না আস্তানার কথা, তোমার অনুচরদের মুখ, অশ্ব রুহী বেচারী না জানি কত কাঁদছে তোমার জন্য।

সব জানি।

তবে কেন আর বিলম্ব? মণীষার বিপদ কেটে গেছে। আজ মণীষাবাসীদের মুখে হাসি ফুটেছে তবুও তোমার কাজের শেষ হবে না? রাণী, তুমি তো জানো মিঃ চৌধুরী মায়ের একমাত্র সন্তান। মায়ের কত সাধ সন্তানের বৌকে একবার পাশে পায়। অথচ তুমি সেই যে বিয়ের পর চলে এলে আর ফিরে গেলে না?

চন্দনা, আমি কি সাধে চলে এসেছি।

সব জানি রাণী, তবু তোমার একবার শাশুড়ির পাশে যাওয়া দরকার। বুড়ো মানুষ কবে কি হন কে জানে।

সত্যি আমি অপরাধী তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে তোকে কথা দিলাম এবার যাবো। সেখানে। কিন্তু একটা চিন্তা আমাকে অহরহ কষ্ট দিচ্ছে সে হলো বনহুরের নিখোঁজ ব্যাপার। জানি না সে জীবিত আছে না মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে......তবে আমার মন বলছে বনহুর মরতে পারে না, কারণ তার কাজ এখনও অনেক বাকি।

রাণীর কথা শুনে চন্দনার বুক চিরে বেরিয়ে এলো একটা দীর্ঘশ্বাস! মুখখানা অন্যদিকে ফিরিয়ে নিলো সে, কারণ চোখ দুটো অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠেছিলো তার।

চন্দনা আর অপেক্ষা না করে ফিরে এলো তাবুতে।

হসপিটালে আরও কাজ আছে রাণীর তাই চন্দনা আর বিলম্ব না করে এসে পড়লো।

তাবুতে প্রবেশ করে থমকে দাঁড়ালো।

শুনতে পেলো মিঃ চৌধুরীর কণ্ঠস্বর, তিনি কারও সঙ্গে যেন কথা বলছেন। কিন্তু তাঁবুতে তিনি ছাড়া আর কেউ ছিলো না। চন্দনা কান দুটো সাজাগ করে শুনতে চেষ্টা করলো, কি বলছেন তিনি।

মিঃ চৌধুরী বলছেন......বনহুর তুমি জীবিত আছে জেনে আমি ভীষণ খুশি হলাম......কুচক্রীর কবলে......জাহাজখানা এখন প্রশান্ত সহাসাগর পাড়ি দিচ্ছে......রাণী, হাঁ। আছে......মন্থনাদ্বীপের......রহস্য মুছে গেছে........সব রাণীকে জানাবো.......একি...... কথা আর শোনা যাচ্ছে না কেন? বনহুর, বনহুর ওয়্যারলেসটা কি খারাপ হয়ে গেলো?

চন্দনা আর স্থির থাকতে পারলো না, দ্রুত এসে দাঁড়ালো মিঃ আহাদ চৌধুরীর পাশে, বললো...কার সঙ্গে কথা বলছিলেন আপনি?

মিঃ চৌধুরী চোখ তুলে তাকালেন চন্দনার মুখের দিকে, বললেন...বনহুরের সঙ্গে।

কোথায় বনহুর? সে জীবিত আছে?

হা জীবিত আছে এবং সে এখন প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে কুচক্রীদের কবলে বন্দী......

তারপর?

জানি না কথা বলতে বলতে হঠাৎ কথা থেমে গেলো। আমার মনে হচ্ছে বনহুরের হাত হতে কেউ ওয়্যারলেস ছিনিয়ে নিলো বা এই ধরনের কিছু ঘটনা ঘটলো।

চন্দনার চোখ দুটো খুশিতে দীপ্ত হয়ে আবার নিষ্প্রভ হলো। কিছু বলতে গেলো কিন্তু পারলো না, কে যেন তার কণ্ঠ রোধ করে দিলো। বনহুরের মুখখানা তার চোখের সামনে ভেসে উঠলো।

বললেন মিঃ চৌধুরী চন্দনা, ওর জন্য আমারও দুঃখ হচ্ছে, কারণ ও ছিলো বীর সৈনিক নির্ভীক, মৃত্যুকে ও ভয় করতো না, আর করতো না বলেই সে আজ সমস্ত বিশ্বে স্থান করে নিয়েছে। কেউ ওকে ভাল নজরে দেখে কেউ ওকে খারাপ মন দিয়ে দেখে কিন্তু ও সবার জন্য ভাবে।

চন্দনা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে ওর মুখের দিকে। একদিন যে আহাদ চৌধুরী দস্যু বনহুরকে পাকড়াও করার জন্য ব্যস্ত সমস্ত হয়ে উঠেছিলেন আর আজ সেই প্রখ্যাত ডিটেকটিভ আহাদ চৌধুরীই তার জন্য দুঃখিত ব্যথিত.......

হঠাৎ পদশব্দে মুখ তুলে তাকালো চন্দনা।

আহাদ চৌধুরীও ফিরে চাইলেন তাঁবুর দরজার দিকে, তার হাতে তখনও ওয়্যারলেসখানা রয়েছে।

তাবুতে প্রবেশ করলো রাণী।

তার চোখেমুখে ক্লান্তির ছাপ।

হসপিটালে তাকে সমস্ত রাত জেগে কাটাতে হয়েছে। কয়েকজন রোগীর অবস্থা অত্যন্ত কঠিন ছিলো, আজ তাদের অবস্থা কিছু ভালো তাই রাণী নার্সদের হাতে তাদের সেবাযত্নের দায়িত্বভার তুলে দিয়ে ফিরে এলো তাঁবুতে।

আহাদ চৌধুরী আর চন্দনাকে একই তাঁবুতে দেখে একটু অবাক হবার ভান করে বললো রাণী–কি ব্যাপার, হঠাৎ এসে পড়ে তোমাদের কোনো অসুবিধা সৃষ্টি করলাম না তোর কিন্তু পরক্ষণেই মিঃ আহাদ এবং চন্দনার মুখমন্ডলে বিষণ্নতার ছাপ লক্ষ করে রাণী অবাক হয়।

রাণী কিছু প্রশ্ন করবার পূর্বেই বলে উঠলেন মিঃ আহাদ চৌধুরী–রাণী, বনহুর বেঁচে আছে এবং সে একটু পূর্বে আমার সঙ্গে কথা বলেছে এই ওয়্যারলেসে।

বল কি বনহুর জীবিত আছে.....একটা আনন্দদীপ্তভাব ফুটে ওঠে রাণীর চোখেমুখে। বিস্ময় আর উচ্ছ্বসিত খুশিভরা ভাব নিয়ে বলে রাণী–কোথায় সে? কোথা হতে ওয়্যারলেসে কথা বলেছিলো তোমার সঙ্গে?

বহুদূর প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে, কোনো এক জাহাজ থেকে সে কথা বলেছিলো। কিন্তু কথা বলবার সময় মনে হলো কেউ তার হাত হতে ওয়্যারলেস কেড়ে নিয়ে তাকে স্তব্ধ করে দিলো.......

বলো কি আহাদ?

হাঁ রাণী। সে জানিয়েছিলো এখন সে নাকি কোনো কুচক্রীদের কবলে বন্দী অবস্থায় আছে। হাত-পা তার শৃঙ্খলাবদ্ধ.......কিন্তু সব কথা তার বলা হয়নি, বলতে গিয়ে থেমে গেলো তার কণ্ঠ। তাকে আবার কোনো বিপদে ঠেলে দেওয়া হলো কি না কে জানে।

রাণীর এবার বুঝতে বাকি রইলো না কেন মিঃ আহাদ চৌধুরী আর চন্দনার মুখ ভাবাপন্ন এবং গম্ভীর লাগছিলো। কেন ওরা এমন নিশ্চুপ হয়ে পড়েছিলো।

রাণীও যখন স্তব্ধ হয়ে গেলো তখন আহাদ চৌধুরী চুপ থাকতে পারলেন না, বললেন–রাণী, তুমি কি মনে করো ওকে কুচক্রীদল হত্যা করেছে।

না, ওকে সহজে কেউ হত্যা করতে পারবে না।

মিঃ চৌধুরী, রাণী আর চন্দনা কথা হচ্ছিলো এমন সময় মণীষার পুলিশপ্রধান এলেন, তিনি একমুখ হেসে বললেন–মণীষা দ্বীপের অভ্যন্তরে যে রহস্য লুকিয়ে ছিলো তার সমাধান হয়েছে, এবার আপনাদের বিদায় জানাতে আমরা দ্বিধাবোধ করবো না। কারণ আমরা জানি আপনাদের খুব কষ্ট হচ্ছে।

মিঃ আহাদ বললেন–হাঁ, বিদায় নেবার সময় এসে গেছে। কাজ সমাধা হয়েছে, আপনাদের সহযোগিতাই আমাদের সক্ষম করেছে এই কাজ সমাধা করতে।

মিঃ চৌধুরী, যে ব্যক্তিটিকে আমরা দেখলাম আপনার সহচরী দুজনকে উদ্ধার করে আনতে সেই বিস্ফোরণ এবং ধ্বংসস্তূপ থেকে, সে কি সত্যি মৃত্যুবরণ করেছে?

গম্ভীর শান্তকণ্ঠে বললেন মিঃ চৌধুরী–জানি না। তার সম্বন্ধে আমরাও সম্পূর্ণ কিছু জ্ঞাত নই। মিঃ আহাদ বনহুরের কথা সম্পূর্ণ চেপে গেলেন। কিছু পূর্বেও বনহুরের সঙ্গে তার কথা হয়েছে কিন্তু এ মুহূর্তে সঠিক কিছু বলা তার পক্ষে মুশকিল কারণ ওয়্যারলেসে কথা বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গিয়েছিলো বনহুরের কণ্ঠ.......

পুলিশপ্রধান আরও কিছুক্ষণ আলাপ–আলোচনার পর বিদায় গ্রহণ করলেন।

চন্দনা খুশিতে উচ্ছল হয়ে বললো–রাণী, এবার আমাদের ছুটি, কি বলো?

রাণী একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললো–জীবিত অবস্থায় বোধ হয় ছুটি হবে না আমাদের।

বললেন আহাদ চৌধুরী–রাণী, ঠিকই বলেছো, একটা কাজ সমাধা হবার সঙ্গে সঙ্গে অপর এক একটা কাজ এসে পড়ে। কর্মময় জীবন এমনি হয়।

*

বনহুরের হাত থেকে আচমকা ওয়্যারলেসটা ছিনিয়ে নিয়ে সাগরবক্ষে নিক্ষেপ করলো মিঃ। মাংসু।

ঐ মুহূর্তে তার হাত দুখানা শৃঙ্খলাবদ্ধ না থাকলে বনহুর নিজেকে সংযত রাখতে পারতো না, আক্রমণ করে বসতো ওকে, এবং ফলাফল কি ঘটতে তাও কিছুটা অনুধাবন করা যায়।

ক্ষুদে ওয়্যারলেসখানা বনহুরের জামার গোপন পকেটে ছিলো অতি কষ্টে পকেট থেকে দাঁত দিয়ে বের করে নিয়েছিলো বনহুর ওয়্যারলেসখানা। তারপর হাতের মুঠায় চেপে ধরে কথা বলছিলো সে মিঃ আহাদ চৌধুরীর সঙ্গে।

কে জানতো মিঃ মাংসু ঐ মুহূর্তে সেখানে হাজির হবে। বনহুর এ ক্যাবিনে একা থাকতো, মাঝে মাঝে মাংসু এসে তাকে নিজ আয়ত্তে আনার চেষ্টা করতো। যেমন জাভেদকে নিজের বশীভূত করতে চেয়েছিলো, তেমনি বশীভূত করতে চায় সে বনহুরকে। অবশ্য বনহুর বলেছে জাভেদের কোনো ক্ষতি সাধন না করলে সে মিঃ মাংসুকে সর্বতোভাবে সাহায্য করবে।

মিঃ মাংসু জানে বনহুর যা বলে তা সে করে এবং সেই বিশ্বাসের ওপরই নির্ভর করে মাংসু বনহুর ও জাভেদের শরীরে হস্তক্ষেপ করেনি।

কিন্তু মিঃ মাংসু যখন জানতে পারলো বনহুর ওয়্যারলেসে কারও সঙ্গে কথা বলছে তখন ভীষণ ক্ষেপে গেলো সৈ। ঐ মুহূর্তে শৃখলযুক্ত বনহুরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো তারপর কেড়ে নিলো ওয়্যারলেসখানা আর নিক্ষেপ করলো সমুদ্র গহ্বরে।

বনহুর নিজের বন্ধনযুক্ত হাত দুখানার দিকে তাকিয়ে নীরব থাকতে বাধ্য হলো সেইক্ষণে।

জাহাজখানা তাদের নিয়ে কোথায় চলেছে কে জানে।

বনহুর আর জাভেদকে জাহাজের অভ্যন্তরে গোপন ক্যাবিনে বন্দী করে রাখা হলো। অবশ্য একই ক্যাবিনে নয়, পাশাপাশি দুটো ক্যাবিনে রাখা হলো, যেন কেউ কাউকে দেখতে না পায়।

মিঃ মাংসু জানে না বনহুরকে বন্দী করে রাখার ক্ষমতা কারও ছিলো না যদি জাভেদ না

থাকতো এ জাহাজে। বনহুর জানে, ডুবু জাহাজ হামবার্ড–এর চালকদ্বয় সবই লক্ষ করছে এবং নিশ্চয়ই তার অবস্থধ লক্ষ করে বিচলিত হয়েছে। বনহুর ওয়্যারলেসটা হারিয়ে একটু বিব্রত হয়ে পড়লো কিন্তু সে ঘাবড়ে গেলো না। উপায় সন্ধান করতে লাগলো কি ভাবে মাংসুর দল ও মাংসুকে সায়েস্তা করা যায়।

সেইদিন ডুবুজাহাজের চালকদ্বয় তাদের জাহাজখানাকে একেবারে নিয়ে এলো মিঃ মাংসুর জাহাজের তলদেশে এবং অতি সাবধানে মাংসুর জাহাজখানাকে ঘায়েল করার চেষ্টা চালাতে লাগলো।

ডুবু জাহাজখানাকে চলন্ত অবস্থায় রেখে কাজ করায় কোনো অসুবিধা নেই তবে বনহুরকে উদ্ধার করা সম্ভব হবে কিনা এটাই হলো তাদের চিন্তা।

তবু ওরা দুজন তাদের ডুবুজাহাজের টেলিভিশন পর্দায় সব দেখছিলো। বনহুর ঐ জাহাজে গিয়ে নিজ ইচ্ছায় বন্দী হলো তাও তারা লক্ষ করলো। ওয়্যারলেসে কিছু কথাবার্তাও হয়েছিলো প্রথম দিকে।

চালকদ্বয় গভীরভাবে চিন্তা করে নিলো, যেভাবে বনহুর নির্দেশ দিয়েছে সেইভাবে তাদের কাজ করতে হবে।

ডুবু জাহাজখানা মাংসুর জাহাজের তলে এসে গেছে। এবার চালকরা তাদের জাহাজ বিধ্বংসী রকেটটির সুইচ টিপবার জন্য প্রস্তুত হয়ে নিলো।

এমন সময় প্রথম চালকটি বললো–বনহুরের হাত-পা শৃঙখলাবদ্ধ রয়েছে, কাজেই আমাদের খুব ভেবেচিন্তে কাজ করতে হবে। জাহাজখানা ঘায়েল করতে হবে কিন্তু সাবধানে। আমরা বনহুরকে হারাতে চাই না।

বনহুরকে নিয়ে যখন ডুবু জাহাজের চালকদ্বয় ভাবছে তখন বনহুর কৌশলে নিজকেমুক্ত করে নিয়েছে। মিঃ মাংসু নিজ ইচ্ছায় তার হাত এবং পা মুক্ত করে দিয়েছে কারণ কোনোক্রমে বনহুর যেন তার জাহাজ থেকে পালাতে না পারে এজন্য কড়া পাহারার ব্যবস্থা করেছে মাংসু তাই তার হাত-পা হতে শৃখল খুলে নেওয়া হয়েছে।

বনহুর যে ক্যাবিনে আটক আছে ঐ ক্যাবিনের দরজা তালাবদ্ধ করে দেয়া হয়েছে।

জাহাজ প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে রায়হান বন্দর অভিমুখে চলেছে।

মাংসুর জাহাজের তলদেশেই রয়েছে জাহাজ হামবার্ড। তারা সুযোগের অপেক্ষায় আছে, একটি মাত্র বোম টিপতেই উপরিভাগের জাহাজখানার তলদেশ ফেঁসে যাবে এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই তলিয়ে যাবে জাহাজখানা।

. কুচক্রী মাংসু এখন নিশ্চিন্ত।

কারণ শুধু বনহুর নয় তার সন্তান জাভেদকেও বন্দী করতে সক্ষম হয়েছে মাংসু। তার বাসনা, চরিতার্থ হয়েছে এবার রায়হান বন্দরে নেমে নিজ আস্তানায় পৌঁছতে পারলেই ব্যস সে সম্পূর্ণ সকাম হবে।

মাংসুর চোখেমুখে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলছে। সে ভাবতেও পারেনি এত সহজে সে বনহুর ও তার সন্তানকে আয়ত্তে আনতে পারবে, তা ছাড়াও প্রতিশোধ নেয়াই হলো তার উদ্দেশ্য। এ ছাড়াও সুচতুর মাংসু বনহুরকে বন্দী অথবা হত্যা করতে পারলে সে নিশ্চিন্ত মনে তার অসৎ ব্যবসা চালিয়ে যেতে পারবে। এটাও তার এক চক্রান্ত কারণ সে জানতো বনহুর তাকে ক্ষমা করবে না। কাউকে সে ক্ষমা করে না যারা কুকর্ম করে।

মিঃ মাংসু অসৎ ব্যবসা করে আজ কোটি কোটি টাকার মালিক। তার কয়েকখানা জাহাজ আছে, যে সব জাহাজ ভর্তি হয়ে মালামাল এ দেশ হতে ও দেশে চালনা যায়।

কুচক্রী মাংস শুধু মালামাল চালান দিয়েই ক্ষান্ত হয় না, সে নরকংকালের ব্যবসাও করে। অগণিত লোককে সে রাতের অন্ধকারে তুলে নিয়ে আসে শহর বন্দর নগর অথবা গ্রাম থেকে। অর্থের লোভ দেখিয়ে নিয়ে আসে তারপর তাদের

বন্দী করা হয় এবং হত্যা করা হয় কারেন্টের সাহায্যে, যেন কংকালের কোনো স্থানে ক্ষত সৃষ্টি না হয়।

যে কংকালে ছেরা অথবা কোন আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায় সে কংকালের কোনো মূল্য নেই। তাই মাংসু এ ব্যাপারে অত্যন্ত সাবধান।

সভ্য সমাজের কেউ জানে না আসল ব্যবসা তার কি। শুধু জানতো বনহুর আর এ কারণেই তাকে দেশ ছাড়া করেছিলো বনহুর। আজ সেই মাংসুর কবলে স্বয়ং দস্যু বনহুর।

মাংসু ভাবছে কোনোক্রমে বনহুর আর তার সন্তানকে নিয়ে তার নরকংকাল তৈরির কারখানায় পৌঁছতে পারলেই হলো, তারপর এরা দুটো নরকংকালে পরিণত হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

মাংসুর চোখেমুখে খুশির উচ্ছ্বাস।

বনহুর নিজ ক্যাবিনে ঘুমানোর ভান করে শুয়ে আছে। দুদিন পূর্বে তার হাত ও পা মুক্ত করে দিয়েছে মাংসু। সে জানে বনহুর আর পালাতে সক্ষম হবে না। কারণ তাকে এমন এক ক্যাবিনে রাখা হয়েছে যে ক্যাবিন শুধু লোহার পাত দিয়ে তৈরি। দরজা ছাড়া বের হবার আর কোনো পথ নেই। দরজায় মস্তবড় তালা লাগালো।

তালার চাবি মাংসু নিজের কাছে রেখেছে।

যেন কেউ সে চাবি না পায়।

জাভেদ পাশের ক্যাবিনে বন্দী আছে।

সে কেমন অবস্থায় আছে জানে না বনহুর তবে সে আন্দাজ করে নিতে সক্ষম হয়েছে। জাভেদকেও তারই মত হাত পা মুক্ত অবস্থায় রাখা হয়েছে এবং ক্যাবিনের দরজায় মজবুত তালা লাগালো রয়েছে।

হঠাৎ বনহুরের চিন্তাজাল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, প্রচন্ড একটা শব্দ, তার সঙ্গে ঝাঁকুনি! সমস্ত জাহাজখানা ভীষণভাবে দুলে উঠলো।

মিঃ মাংসু চিৎকার করে বললো–ক্যাপ্টেন, আমাদের জাহাজখানা কোনো ডুবন্ত জাহাজের সঙ্গে ধাক্কা খেয়েছে। নিশ্চয়ই তলা ফেঁসে গেছে অথবা নিচের অংশ ভেঙে গেছে......

ক্যাপ্টেন এবং আরও দুজন নাবিক ছুটে এলো।

ক্যাপ্টেন বললো–মালিক, আর রক্ষা নেই। আমাদের জাহাজের তলায় প্রচন্ড আঘাত লেগেছে তলা ফেঁসে গেছে......

মাংসু বিবর্ণ মুখে বললো–এখন উপায়?

বাঁচবার কোনো উপায় দেখছি না মালিক, মৃত্যু অনিবার্য.......

ক্যাপ্টন, আমাদের জাহাজ তলিয়ে যাচ্ছে.......

হাঁ মাংস, আর রক্ষা নেই......চাবি দাও যে ক্যাবিনে তুমি সেই তরুণকে বন্দী করে রেখেছো!

বনহুর তুমি? কি করে সেই ক্যাবিন থেকে বের হলে। তোমার ক্যাবিন লোহার পাত দিয়ে তৈরি......

কিন্তু মেঝে তো আর লোহার পাত দিয়ে তৈরি করেনি। তোমার বোকামি সেখানেই।

তুমি তাহলে মেঝের তক্তা সরিয়ে.......

ওসব শুনে তোমার কোন লাভ হবে না মাংসু। চাবি দাও এবং বাঁচার উপায় খোঁজো।

জাহাজখানা দ্রুতগতিতে তলিয়ে যাচ্ছে।

মাংসুর মুখমণ্ডল ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে। সে ক্যাপ্টেনের মুখের দিকে অসহায় চোখে তাকালো।

বনহুর মুহূর্ত বিলম্ব না করে বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরলো মাংসুর গলা, বললো–চাবি দাও।

মাংসু বাধ্য হলো এবার পকেট থেকে চাবি বের করে দিতে।

ক্যাপ্টেন এবং মাংসুর অন্যান্য অনুচর তখন নিজ নিজ প্রাণ রক্ষার জন্য উন্মাদ হয়ে উঠেছে। তারা কেউ কারও দিকে তাকিয়ে দেখার সময় পাচ্ছে না।

মাংসুও বনহুরের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে ছুটলো লাইফবয় যেদিকে রয়েছে সেই দিকে। যদি জীবন বাঁচাতে পারে তাহলে ভাগ্য।

বনহুর চাবি নিয়ে দৌড়ে গেলো জাভেদের ক্যাবিনের পাশে। দরজা খুলে ফেললো।

জাভেদ বসে ছিলো, দরজা খুলতেই উঠে দাঁড়ালো।

আজ আর জাভেদ বনহুরকে দেখে পূর্বের মত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো না, সে তাকিয়ে রইলো বনহুরের দিকে।

বনহুর ব্যস্ত কণ্ঠে বললো–শিগগির চলে এসো জাভেদ জাহাজখানা এক্ষুণি তলিয়ে যাবে।

জাভেদ কিছু ভাবলো কিন্তু কোনো প্রতিবাদ করলো না। সে বনহুরের পাশ কেটেবেরিয়ে এলো ক্যাবিনের বাইরে। বনহুরও জাভেদের সঙ্গে বেরিয়ে এসে হাত ধরলো জাভেদের, যেন সে পানিতে ঝাঁপিয়ে না পড়ে।

আজ জাভেদ শান্ত।

সে কোনো প্রতিবাদ করলো না।

বনহুর ওকে সহ দ্রুতগতিতে জাহাজের রেলিংয়ের ধারে গেলো যেখানে সে তার ডুবুরীর ড্রেস খুলে রেখেছিলো।

বনহুর এবার ডুবুরীর ড্রেস পরে নিলো তারপর জাভেদের হাতে তুলে দিলো একটি লাইফবয়, বললো সে–জাভেদ, তুমি এটা নিয়ে সাগরবক্ষে লাফিয়ে পড়ো। আমি থাকবো তোমার পালে......নাও আর বিলম্ব করো না, এই দেখো জাহাজখানা তরিয়ে গেলে প্রায়......।

জাভেদ বনহুরের কথা শুনে কোনো প্রতিবাদ করলো না, সে বিনা দ্বিধায় লাইফবয় আঁকড়ে ধরে সাগরবক্ষে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

কনহুরও সেই মুহূর্তে ডুবুরীর ড্রেসে সজ্জিত অবস্থায় লাফিয়ে পড়লো জাভেদের পাশে।

জাহাজখানা তখন প্রচন্ড বিস্ফোরণ করে তলিয়ে গেলো।

কোথায় নিমজ্জিত হলো তা কেউ জানলো না। মিঃ মাংসুর সব আশা সমূলে ধ্বংস হলো।

বনহুর জাভেদকে নিয়ে ফিরে এলো ডুবু জাহাজে। সে জানতে ডুবু জাহাজের জাহাজবিধ্বংসী সাবমেরিন দ্বারা মাংসুর জাহাজটিকে ঘায়েল করা হয়েছে এবং সেই কারণেই বনহুর জাভেদকে নিয়ে সাগরবক্ষে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো।

জাহাজের চালকদ্বয় কৌশলে উদ্ধার করে নেয় বনহুর আর জাভেদকে।

ডুবুজাহাজে ফিরে এসে বনহুর জাভেদকে একটি শয্যায় শুইয়ে দেয় কারণ তার দেহে কোন জলরোধক পরিচ্ছদ ছিলো না তাই সাগরের নোনা পানিতে তার শরীর ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়ে।

ডুবু জাহাজে আসার পর বনহুর জাভেদকে নিয়ে বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লো, সে যতটুকু জানে সেইভাবে চিকিৎসা এবং সেবা যত্ন করতে লাগলো। সবচেয়ে বেশি খুশি লাগছে বনহুরের, এবার জাভেদ তার প্রতি কোনো নিষ্ঠুর আচরণ করেনি তবে জাভেদ যে তাকে চিনতে পারেনি এটা সত্য। চিনলে সে একেবারে নীরব থাকতে পারতো না বিশেষ করে তার চোখেমুখে সেই উচ্ছ্বাস প্রকাশ পেতো।

বনহুর চালকদ্বয়কে নিজ আয়ত্তে এনে নিতে সক্ষম হয়েছে। কাজেই ডুবুজাহাজখানা এখন তারই আয়ত্তাধীন। জাভেদ আজ তার পাশে কাজেই বনহুর আজ সবচেয়ে বেশি খুশি। আরও খুশি লাগছে তারা জয়ী হয়েছে, সে ধ্বংস করেছে জলদস্যু হামবার্ডের সব অস্তিত্ব। ধ্বংস করেছে মারণাস্ত্র তৈরির ঘাঁটি এবং উদঘাটন করতে পেরেছে মণীষা দ্বীপের রহস্য।

মাঝে মাঝে ইলোরার কথা স্মরণ হয়। বনহুরের মনে তখন ওর চোখ দুটো অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে। একটা ব্যথা বারবার তার মনকে জর্জরিত করে তোলে।

আজ রাণীর সঙ্গে রয়েছে নূর।

সঙ্গে রয়েছে ছদ্মবেশে রহমত এবং রাণীর আরও দুজন অনুচর। অনুচরদ্বয়ের নিকট রয়েছে প্রচুর অর্থসহ থলে।

রাণী এসব থলে হতে অর্থ নিয়ে বস্তির ক্ষুধার্ত মানুষগুলোর মধ্যে বিলিয়ে দিচ্ছে। রাণীর মুখে হাসির উচ্ছ্বাস, চোখে তার খুশির উৎস।

তেমনি যারা রাণীর হাতে অর্থ নিচ্ছে তাদের মনেও এক অপূর্ব আনন্দের বন্যা বয়ে চলেছে। তারা অনেকেই গৃহহারা, বৃদ্ধ নারী এবং শিশু।

রাণীকে সহায়তা করছে নূর। .

বস্তির মানুষগুলো যেনো বাঁচার প্রেরণা পাচ্ছে। অনেকের কুঠিরে আলো জ্বালার তেলের পয়সা নেই, ঘরে রান্নার চাল নেই। এমন কি অনেকের পরনে শতছিন্ন বস্ত্র যা দিয়ে লজ্জা নিবারণ হয় না।

ঘরে ঘরে শিশুরা ক্ষুধার জালায় কান্নাকাটি করছে। পরনে কাপড় নেই, কতকগুলো ছেলেমেয়ে একেবারে উলঙ্গ বলা যায়। দূরে কোনো কোনো স্থানে লাইটপোষ্ট থেকে মিটমিটে লালচে আলো লাইট পোষ্টের তলদেশ আলোকিত করে আছে। তবে সে আলোর ছটায় পথ বা বস্তি এলাকা আলোতে পরিপূর্ণ নয়। কেমন যেন ঘোলাটে অন্ধকার চারদিকে।

রাণী যখন বস্তির মানুষগুলোর মধ্যে দুহাত ভরে টাকা–পয়সা বিলিয়ে দিচ্ছিলো তখন রাণীর পরনে ছিলো স্বাভাবিক সাধারণ মহিলার ড্রেস–শাড়ি আর ব্রাউজ। মাথায় ঘোমটা স্বল্প পরিসর। চুলগুলো এলোমেলো, কপালের ওপর ছড়িয়ে আছে কিছুটা।

এ মুহূর্তে রাণীকে দেখলে কেউ বুঝবে না এই সেই দস্যুরাণী যার প্রচন্ড দাপটে কম্পিত হয় গোটা রায়হান। সুন্দর মায়াময় দুটি চোখ, সে চোখে নেই কোনো কাঠিন্যের আভাস।

নূর ওকে যত দেখে ততই বিস্মিত হয়, কেন যেন মনে পড়ে ওর পাশে তার আব্বুর মুখখানা। তার আবুকেও সে দেখেছে এমনি করে দীনদুঃখী অসহায় মানুষগুলোর পাশে গিয়ে দাঁড়াতে। শুনেছে এমনি করে তার আল্লু অসহায়

মানুষগুলোর মধ্যে খাদ্যদ্রব্য টাকাকড়ি বিলিয়ে দেয়। তখন তার চোখেমুখে একটা উজ্জ্বল আনন্দদ্যুতি খেলে যায়। সে আনন্দ সীমাহীন তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

বস্তির মানুষগুলোর অবস্থা দেখলে বড় মায়া হয়। চোখ বসে গেছে, কংকালসার চেহারা, পরনে ছিন্নবসন, কেউ–কেউ অর্ধ উলঙ্গ আবার কেউ সম্পূর্ণ উলঙ্গ বলা যায়।

ওদের দেহ থেকে উৎকট গন্ধ বেরিয়ে আসছে। না জানি কদিন ওরা গোসল করতে পারেনি। পরিষ্কার করতে পারেনি পরিধেয় বস্তু। ময়লা জমে উঠেছে দেহে এবং জামাকাপড়ে। কারণ এদের গোসল করে পরবার মত বস্ত্র নেই, এদের শরীর পরিষ্কার করবার মত সাবান নেই এমন কি সচ্ছ পানিও জোটে না এদের ভাগ্যে।

এরা কি মানুষ না জীব ভাবলে কষ্ট হয়। অথচ ওদের অনুগ্রহে সভ্যসমাজের মানুষগুলো সভ্যভাবে বাঁচার অধিকার পেয়েছে। শহরের আকাশচুম্বী ইমারতগুলি কারা গড়ে তুলেছে, কাদের শরীরের ফোঁটা ফোঁটা ঘাম দিয়ে তৈরি হয়েছে জাঁকজমকপূর্ণ রাজকীয় বাসভবনগুলো। কারা আজ মানুষনামী ভদ্রসমাজকে সভ্যতার জগতে নিয়ে এসেছে। সারাটা দিন হাড়ভাঙা খাটুনি করে কারা? যানবাহন চালক, রাজমিস্ত্রী, শ্রমিক, ঝাড়ুদার যেদিকে তাকানো যায় আজ ওদের রক্তের দান আমরা দেখতে পাই চারদিকে। শহরের মানুষের মুখে অন্ন তুলে দেয় কারা? মাঠে মাঠে ফসল ফলায় কারা? তারা এই অসহায় দীনমজুর।

এক সময় সব অর্থ বিলিয়ে দেয়া শেষ হয়।

রাণী হেসে বলে কি দেখছেন মিঃ নূর?

আপনাকে। সত্যি আপনার তুলনা হয় না। বললো নূর।

একদিন তুমি বলেই সম্বোধন করেছিলো নূর রাণীকে, সেদিন ছিলো রাণী তার কাছে অদ্ভুত বিস্ময়কর এক নারীমূর্তি। যদিও আজও তার কোনো পরিচয় নূর তেমন করে পায়নি তবুও যেন কত পরিচিত ও।

মায়াভরা দুটি চোখ।

মুখমন্ডলে একটা দৃঢ় দীপ্ত ভাব।

নূর প্রথম দিন ওকে দেখে বিস্মিত হলেও এখন তা আর নেই, আজকাল ওকে কেমন যেন আপনজন মনে হয়। যদিও আসল নামটাও তার জানে না নূর তবু ওর সম্বন্ধে একটি মহৎ ধারণা রয়েছে।

বললো রাণী–কি ভাবছেন মিঃ নূর?

বললো নূর—-সত্যিকারের মানুষ আপনি। কারণ যাদের নিয়ে কেউ ভাবে না আপনি তাদের নিয়ে ভাবেন।

যাদের নিয়ে কেউ ভাবার নেই তাদের নিয়েই তো ভাবতে হয় মিঃ নুর।

জানি না কে আপনি কি আপনার পরিচয়। কিছুই জানি না আপনার সম্বন্ধে তবু আপনাকে দেখলে শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে। কারণ আপনি যাদের নিয়ে ভাবছেন এবং যাদের জন্য এত করছেন তারাই তো মানুষ। ওরা যদি না থাকতো তাহলে সভ্যসমাজ আজ অন্ধকারের অতলে তলিয়ে যেতো।

মিঃ নূর, আপনার কথাগুলো বড় সুন্দর। একটা কথা কি জানেন?

বলুন?

কথাগুলো বলতে বলতে গাড়িতে এসে বসে নূর এবং রাণী। অপর আর একটি গাড়িতে রহমত এবং আরও দুজন রাণীর অনুচর রয়েছে।

নূর বললো–চলুন না আমার বাংলোয়, অনেক কথা হবে সেখানে। তবে কি জানেন আমার বাংলো আপনার জন্য নিরাপদ নয়।

হেসে বললো রাণী–জানি মিঃ নূর।

জানেন। তাহলে আপনি সেদিন আমার বাংলোয় কোন সাহসে গিয়েছিলেন বলুন তো?

সাহস! তা আমার আছে।

তবে আজও চলুন।

বেশ চলুন কিন্তু হঠাৎ যদি কেউ এসে পড়ে তখন আত্মীয় বলে পরিচয় দেবেন।

সব ক্ষেত্রেই তা সম্ভব হবে কি?

যেমন?

ধরুন আমার আপনজন যদি কেউ এসে পড়ে যারা আমার সব কিছু জানেন?

অসুবিধা হবে না, পরিচিতা বলে কাটিয়ে নেবেন। হাঁ, আপনি বললেও আজ যেতাম না তবে আপনার সঙ্গে আমার কিছু আলাপ আছে এবং সে কারণেই আপনার বাংলোয় যাচ্ছি।

চলুন? নূর নিজেই ড্রাইভ আসনে বসে হ্যান্ডেল চেপে ধরলো, তখন নূরের চোখেমুখে ফুটে উঠেছে একটা দীপ্তভাব।

বাংলোয় প্রবেশ করতে কোনো বাধা আসে না। কারণ নূর গাড়ি ড্রাইভ করছিলো, কারও মনে কোনো সন্দেহ জাগার কথাও নয়।

দারোয়ান গেট খুলে সরে দাঁড়ায়।

গাড়ি বারান্দায় গাড়ি এসে থামতেই বয় এসে গাড়ির পেছন দরজা খুলে ধরলো, নামলো রাণী।

নূর পূর্বেই ড্রাইভ আসন ত্যাগ করে নেমে পড়েছিলো। সম্মুখে এসে দাঁড়িয়ে বললো–চলুন।

সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে আসতেই নূর আর রাণী থমকে দাঁড়ালো, কারণ তাদের সম্মুখে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে মনিরা। কতকটা পথ আগলেই বলা যায়। গম্ভীর কণ্ঠে বলে উঠলো মনিরা–নূর, এ মেয়েটি কে? একটু অবাক হলেও নূর হেসে বললো–আম্মু কখন এলে?

পূর্বের ন্যায় গম্ভীর কণ্ঠে বললো মনিরা–যে প্রশ্ন করলাম তার জবাব দাও নূর?

আম্মু, ভেতরে চলো সব বলবো।

তোমাকে ওর পরিচয় জানিয়ে তারপর ভেতরে প্রবেশ করতে হবে।

আম্মু।

জবাব দিবি না?

দেবো কিন্তু ভিতরে চলো।

না, আমি ওকে ভেতরে যেতে দেবো না। আমি জানতে চাই কে ও?

এবার রাণী হেসে বলে–আমার সঙ্গে আপনার ছেলের কোনো সম্বন্ধ নেই।

ওর বাবার সঙ্গে আপনার সম্বন্ধ আছে আমি তা ভালভাবে জানি আর জানি বলেই এসেছি এখানে।

রাণী পূর্বের ন্যায় হাস্যোজ্জ্বল মুখে বললো–ওর বাবার পরিচয় আমি জানি না তবে আমার ধারণা যদি সত্য হয় তাহলে তার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব ছাড়া অন্য কোনো সম্পর্ক নেই।

আম্মু তুমি কি বলছো আর উনি কি বলছেন সব ঘোলাটে লাগছে আমার কাছে।

রাণী বললো–বোন, আপনি সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে আর আমি একটি সাধারণ মেয়ে কিন্তু আপনার যেমন মানসম্মান বা ইজ্জত আছে আমারও তাই। আপনার স্বামীর সঙ্গে আমার কোনো সম্বন্ধ থাকতে পারে এমন চিন্তাধারা কেমন করে এলো আপনার মাথায়। এবার আমি নতুন এক পথের সন্ধান পেয়েছি......রাণীর চোখ দুটো দীপ্ত হয়ে উঠলো।

নূর বিস্ময় ভরা চোখে তাকিয়ে আছে।

তার আম্মুকে এমনভাবে কথাবার্তা বলতে দেখে অবাক হয় নূর। সত্যি সব এলোমেলো লাগছে তার কাছে।

নুর আর মনিরাকে লক্ষ্য করে বললো রাণী–আজ আর কথা নয় পরে দেখা হবে।

নুর বললো–সেকি এমনি করে চলে যাবেন? আপনি বললেন অনেক কথা আছে।

হাঁ–আছে কিন্তু আজ আর সম্ভব নয় আবার আসবো।

কোথায় যাবেন তা হলে চলুন পৌঁছে দিয়ে আসি?

আজ আর নয়। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন মিঃ নূর আমি নিরাপদেই গন্তব্য স্থানে পৌঁছে যাবো। কথা শেষ করেই সিঁড়ি বেয়ে নেমে যায় নিচে।

কয়েক মিনিট নূর এবং মনিরা উভয়েই নীরব থাকে।

তারপর বলে নূর–আম্মু তুমি ওর পরিচয় জানতে চেয়েছিলে, শুনে রাখো আমি নিজেও পরিচয় জানিনা। তবে এই সেই নারী যে একবার এসে প্রচুর অর্থ আমার হাতে দিয়ে বলেছিলো এ অর্থ তুমি তাদের মধ্যে বিলিয়ে দেবে যারা বনহুরের দয়ায় বেঁচে আছে।

মনিরা বলে উঠলো–আমি জানতাম আর সেই কারণেই এসেছি।

আম্মু কে তোমাকে এ সংবাদ দিয়েছিলো?

বলবো না।

তুমি না বললেও আমি জানি মকবুল তোমাকে সব জানিয়েছে।

হাঁ, তাই বলে তাকে তুই শাসাতে পারবি না বলে দিচ্ছি।

না, কখনও না। তুমি যা বলবে তাই করবো।

তবে বল, ও মেয়েটি কে? কি ওর পরিচয়?

সত্যি আম্মু তুমি বিশ্বাস করো আমি জানিনা। হঠাৎ একদিন গভীর রাতে ও এসেছিলো। পুলিশপ্রধানের বাংলোয় তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে, তখন ওর সঙ্গে আমার পরিচয় হয় রিভলভারের মুখে।

বলিস কি?

হা আম্মু।

তারপর?

তারপর সে সশরীরে আমার বাসায় এসে হাজির–তখন তার শরীরে অদ্ভুত ড্রেস, হাতে রিভলভার। সঙ্গে কয়েক লক্ষ টাকা।

মনিরা অবাক হয়ে সন্তানের কথাগুলো শুনে যাচ্ছে। সব যেন বিস্ময়কর মনে হচ্ছে তার কাছে।

নূর বললো–সেই রাতে ওকে দেখে সত্যি বলতে কি আমি বেশ ভড়কে গিয়েছিলাম। এত অর্থ আমাকে দিচ্ছে, কি এর উদ্দেশ্য এবং কে সে। জানো আম্মু, আজও আমি সঠিকভাবে জানিও না ওর পরিচয়। সে যে একজন মহৎ মহিলা তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

মনিরা সন্তানের কথায় খুব একটা সন্তুষ্ট হতে পারলো না, সে বললো–ওর উদ্দেশ্য কিছু আছে। তোর আব্বু কতদিন আসে না, হয়তো ও তার খোঁজ জানে।

সে কথা সত্য হতে পারে আম্মু, কারণ এই মেয়েটি যে সব গরিব দুঃস্থ মানুষদের মধ্যে অর্থ বিলিয়ে দেয় তারা আব্বুর দয়ায় যারা দুমুঠো খেতে পেতো। আজই আব্বুর অবর্তমানে তাদের দুরবস্থার অবধি নেই, তাদের মধ্যেই সে.....

জানি নূর, ওর সম্বন্ধে আমাকে আর বেশি করে বলতে হবে না। ঐ নারী আমার স্বামীকে হরণ করেছে, এবার আমার সন্তানকেও আত্মসাৎ করার চেষ্টায় আছে.......

আম্মু, তুমি এসব কি যা তা বলছো। তুমি না উচ্চশিক্ষিত মহিলা। আমি জানি আব্বু জীবনে বেঁচে থাকলে কেউ তাকে আটকে রাখতে পারবে না আর আমার কথা বলছে, আমি চিরকাল তোমারই থাকবো.......কথাটা বলতে গিয়ে নূর মাকে জড়িয়ে ধরে উচ্ছাস হাসিতে ফেটে পড়ে, তারপর বলে–চল আম্মু, তোমাকে বাসায় রেখে আসি। অনেক দিন দাদীমার সঙ্গে গল্প করা, হয়নি, আজ অনেক কথা আছে তার সঙ্গে। নূর মনিরার হাত ধরে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে আসে।

গাড়ি–বারান্দায় গাড়ি অপেক্ষা করছিলো। গাড়ির পেছনের আসনের দরজা খুলে ধরে বলে নূর–বসো আম্মু।

মনিরা গাড়িতে উঠে বসে।

নূর উঠে বসলো ড্রাইভ আসনে।

সেদিন আর নূরের ফেরা হলো না।

মরিয়ম বেগম ছাড়লেন না নাতাঁকে। বললেন–তোর সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে।

মনিরা শুধু তাকিয়ে থাকে নূরের মুখের দিকে। এ যেন সেই মুখ, সেই হাসি, সেই কথা বলার ভঙ্গী, সেই দুটি চোখ.....

হেসে বলে নূর–তুমি অমন করে কি দেখো আম্মু আমার মুখে তাকিয়ে তাকিয়ে

তোর মুখে যে তোর আব্বুর প্রতিচ্ছবি খুঁজে পাই বাবা।

আম্মু তুমি আব্বুর জনা বড় ভাবো।

ভেবে তো কোনো ফল হলো না, তাকে পেলাম কই। কত আশা ছিলো স্বামী–সন্তান নিয়ে সুখে ঘর বাঁধবো কিন্তু সব আশা বাসনা আমার ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। বাষ্পরুদ্ধ হয়ে আসে মনিরার কণ্ঠস্বর।

মায়ের চোখে সে আজ নতুন করে অশ্রুর বন্যা দেখেনি, জ্ঞান হবার পর থেকেই নূর মাকে নীরবে অশ্রু বিসর্জন করতে দেখেছে। মায়ের বুকভরা ব্যথা জানে নূর, সে ব্যথাকে নূর চায় না আরও গভীর করতে। তাই নূর মুখে হাসি টেনে বললো–আম্মু তুমি কি জানো না আব্বুরও কত কাজ? সমস্ত দেশ জুড়ে সবাই চায় তার সাফল্য, তার জয়।

মনিরা বলে ওঠে–তাহলে তুই কি বলতে চাস তোর আব্বুকে দেশবাসী সবাই ভালবাসে?

হাঁ আম্মু, তুমি কি তা জানো না?

তাহলে তোর আব্বু রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে নিজকে আড়ালে রাখতো না। তোর আব্বুর প্রাণনাশের চেষ্টাও হতো না।

আব্বুকে যারা ভালবাসে তারাই মানুষ আর যারা আর প্রাণনাশের চেষ্টা করে তারা কাপুরুষ। তুমি জানো না আব্বু কত মহৎ.....

এমন সময় মরিয়ম বেগম সেই কক্ষে প্রবেশ করেন। তিনি একমুখ হেসে বলেন–মায়ের সঙ্গে কথা বলে শেষ করতে পারলি না। এসেছিস আমার সঙ্গে গল্প করতে। তোকে নিরিবিলি দুটো কথা বলবো তারও সময় হয় না।

নুর হেসে উঠে বলে–তোমার সঙ্গে অনেক কথা বলবো আজ। যাও আম্মু, তুমি আমার জন্য আজ নিজ হাতে পায়েস রান্না করবে। কতদিন তোমার হাতে পায়েস খাইনি।

মনিরার চোখ দুটো ছল ছল হয়ে আসে। এমনি করে বনহুর বলেছিলো একদিন, যাও মনিরা, তুমি আজ নিজ হাতে পায়েস তৈরি করবে, কতদিন তোমার হাতে তৈরি পায়েস খাইনি। ......আঁচলে চোখের পানি মুখে নিয়ে বেরিয়ে যায় মনিরা।

নূর মরিয়ম বেগমকে পাশে বসিয়ে বলে–দাদীমা, বলো তোমার কথা শুনি, তারপর আমার কথা।

মরিয়ম বেগম একটু গম্ভীর হবার ভান করে বললেন–একা বাসায় থাকিস্ বলতে কেমন লাগে?

সত্যি বলবো? বললো নূর।

মরিয়ম বেগম বললেন–হাঁ বল?

বড় ভাল লাগে তবে প্রায়ই তোমার কথা মনে হয়।

তাহলে ওখানে থাকিস কেন? যদি কান্দাই শহরে তোর কোনো বাড়ি বা আত্মীয়–স্বজন না থাকতো তাহলে কথা ছিলো।

এটা তোমার এক নম্বর প্রশ্ন বুঝি?

হাঁ বল?

বিদেশ থেকে যে দায়িত্বভার গ্রহণ করে দেশে ফিরে এসেছি তা পালন করতে গেলে নিজ বাসায় অবস্থান করা যায় না। এতে নানা রকম অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। কাজেই আমাকে এ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়েছে।

আচ্ছা নূর, তোর মায়ের মুখের দিকে চেয়েও কি তোর মায়া হয় না?

দাদী আম্মু, তুমিও দেখছি বড় অবুঝ।

সাধে কি আর অবুঝ হই দাদু। সমস্ত দিন ধরে তোমার আম্মু শুধু চোখের পানি ফেলে আর গম্ভীরভাবে চিন্তা করে। জানিস্ তো তোর আব্বু ওকে সারা জীবন কাদিয়েছে…

নূর গম্ভীর হয়ে পড়লো।

কথাটা দাদীমা মিথ্যা বলেনি, কারণ তার জ্ঞান হবার পর থেকে সে মাকে নীরবে কাঁদতে দেখেছে। তার সুন্দর মুখমন্ডল সদা বিষণ্ণ দেখেছে, তখন সে ভাবতে পারেনি মায়ের ব্যাথাটা কোথায়। আজ সে সব বোঝে জানে।

দাদীমা নূরকে ভাবতে দেখে বললেন–দাদ লক্ষী–সোনা, এবার একটি বিয়ে করে ফেল তাহলে হয়তো বৌমা অনেকখানি সান্তনা খুঁজে পাবে নিজের মনে।

এবার নূর হেসে উঠলো হো হো করে, তারপর সে বললো—-তাই বলো, এতক্ষণে তোমার। মুখ থেকে আসল কথা বের হলো কি বলো? বিয়ে, তাতে কি ফল হবে বলো?

বৌ ঘরে এলে নিশ্চয়ই সংসারী হবি।

ওঃ এখন বুঝি সংসারী নই?

না

কি করে বুঝলে?

সারাদিন কোথায় থাকি কি করিস্ কিছু জানি না। শোন নূর, একটি মেয়ে দেখেছি–ভারী সুন্দর, তা ছাড়া উচ্চশিক্ষিতা ধনবানকন্যা।

তাই বুঝি এত কথা। নূর অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে, তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে একটি মুখ, সে মুখ ফুল্লরার। নূর নানা কাজে ব্যস্ত থাকে তাই সে ভাববার সময় পায় না, যখন সে নিরিবিলি বিশ্রাম করে তখন ঝরণার ধারে পাথরের বুকে একটি

তরুণীর নৃত্যমুখর চঞ্চল আঁচল মনে পড়ে, মনে পড়ে দুখানা নুপুরপরা পা। এলোমেলো চুল ছড়িয়ে আছে গোটা পিঠময়।

নূরকে অন্যমনস্কভাবে কিছু চিন্তা করতে দেখে বললেন মরিয়ম বেগম–কি ভাবছিস নূর?

হেসে বললো নূর–কিছু না।

আমি যে মেয়েটির কথা বললাম তাকে দেখলে অপছন্দ করতে পারবি না। তা ছাড়া বাপের একমাত্র মেয়ে। মস্ত বড় ধনবান, অনেকগুলো ইন্ডাস্ট্রির মালিক।

শুনলাম, এবার তাহলে পিতার নামটা বলে ফেলো? কান্দাই শহরে সবাইকে একরকম প্রায় চিনে নিয়েছি, বয়স কম হলেও যে ব্যবসা করি তাতে চিনতে বাধ্য হয়েছি।

মরিয়ম বেগম হাসি দীপ্ত মুখে বললেন–মিঃ শাহ আলম......

কথা শেষ করতে দেয় না নূর মরিয়ম বেগমকে, বলে ওঠে–যা বলেছে তা সত্য। শাহ আলম ধনকুবেরু তবে তাঁর মেয়ের খোঁজ আমি জানি না।

এমন সময় মনিরা দুটি প্লেটে পায়েস নিয়ে প্রবেশ করলো।

নুর তাড়াতাড়ি উঠে মায়ের হাত হতে প্লেট দুখানা নিয়ে টেবিলে রাখলো, তারপর মাকে একটি চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে বললো–উঃ আম্মু বড় কষ্ট দিলাম তোমাকে।

মনিরা বললো–কষ্ট! কিসের কষ্ট মেয়েদের কত আনন্দ স্বামী সন্তানকে নিজ হাতে রান্না করে পরিবেশন করে খাওয়ানো। সাধ আমার কোনোদিন মিটালো না।

ছিঃ আম্মু তুমি একটুতেই এত দুঃখ পাও আমি ঘাবড়ে পড়ি। আব্বু না হয় দূরে থাকেন আমি তো সব সময় তোমার কাছাকাছি আছি। নুর কথাটা বলে টেবিল থেকে একটা প্লেট নিয়ে মরিয়ম বেগমের হাতে দেয়, তারপর নিজে একটা প্লেট তুলে নিয়ে চামচ দিয়ে তুলে খেতে খেতে বলে–সত্যি আম্মু, তোমার হাতের রান্না খুব সুন্দর। পায়েসটা আমার খুব ভাল লাগে। কত স্বাদ তোমার রান্না পায়েসে।

মরিয়ম বেগম বলে–কার শিক্ষা দেখতে হবে তো।

হেসে বলে নুর–তা অবশ্যি সত্য। তোমার শিক্ষার গুণেই তো আম্মু আজ আদর্শ মা হতে পেরেছে। দাদীমা, সব প্রশংসা তাহলে তোমার, কি বলে?

ওসব এখন থাক। এবার বল কি কথা আছে আমার সঙ্গে বললেন মরিয়ম বেগম।

নূর বললো–হাঁ, ঠিক কথা মনে করেছে দাদীমা। শোন, আমি তোমাদের নিয়ে এমন এক জায়গায় যাবো যেখানে তোমরা কোনোদিন যাওনি।

খুব সুন্দর জায়গা বুঝি? বললেন মরিয়ম বেগম।

একটু হাসবার চেষ্টা করে বললো মনিরা–মামীমা, তুমি ওর হেয়ালিপূর্ণ কথা কিছু বুঝবে না। যেখানে ও তোমাকে নিয়ে যেতে চায় সে জায়গা বস্তির পচা ও গন্ধময় এলাকা।

আম্মু।

হ্যাঁ, আমি জানি। যেমন তোর আব্বু তেমনি তুই। যেখানে মানুষ যেতে পারে না। নাকে কাপড়চাপা দিতে হয়। পদা দুর্গন্ধময় স্থান,,.....

চুপ করো আম্মু, তোমার মুখে এসব কথা শোভা পায় না। বস্তি এলাকায় যারা বাস করে তারা। কি মানুষ নয়?

মানুষ কিন্তু তাদের এসব জায়গায় বসবাস করে অভ্যাস হয়ে গেছে।

জানো আম্মু তারা কারা?

জানি নোংরা অপরিষ্কার মানুষ ওরা। ওরা কাদা আর পচা জায়গায় থাকতে ভালবাসে। আমরা ওখানো দুদিন বাঁচবো না।

ছিঃ অমন করে বলতে নেই। আম্মু আজ যে ইমারতে সুখে সাচ্ছন্দে বসবাস করছো এ ইমারত কাদের রক্তের বিনিময়ে গড়ে উঠেছে? আজ যে খাবারগুলো তোমরা উদর পূর্ণ করে খাচ্ছো

তা কাদের দান? কারা তারা–ঐ বস্তির নোংরা মানুষগুলো।

আমি অত শুনতে চাইনা নূর। তোর আব্বুর মুখে বহুবার ঐ উক্তি শুনেছি–আর নয়। জীবনটাকে সে নিঃশেষ করে দিয়েছে আবার তোর মুখেও সেই কথা। এত করে বলি ওদের নিয়ে তোদের মাথাব্যথা কেন?

আম্মু তুমি জানো না এই মানুষগুলোর জন্যই আজ সভ্যসমাজ টিকে আছে, তাই তারা আরামে আয়েসে দিন কাটাচ্ছে। একটু থেমে বললো আবার নূর–ওদের ঐ অবস্থার জন্য দায়ী কারা? আজ যারা নেতৃস্থানীয় তারা, বুঝলে আম্মু? কারণ একশ্রেণীর মানুষ শুধু শোষণ আর নিষ্পেষণ করেই চলেছে, তাদের জন্য করবার যেন এদের কিছুই নেই। আম্মু আমার ধারণা আব্বু এই নিষ্পেষিত মানুষগুলোর জন্যই সংগ্রাম করে চলেছে। আজ তারা অবহেলিত লাঞ্ছিত, বস্তি এলাকায় ছোট্ট কুটিরে বাস করে–খেয়ে না খেয়ে দিন কাটাচ্ছে।

নূর বিদেশ থেকে এই শিক্ষাই কি লাভ করে এসেছিস? সারাটা দিন যদি ওদের নিয়েই ভাববি তাহলে কেন এত লেখাপড়া শিখেছিলি? নূর, আমি কি চাই না মানুষ যারা তারা মানুষের অধিকার পাক?

তবে কেন আম্মু তুমি ওদের সম্বন্ধে এমন করে কথা বলো?

এতক্ষণ মরিয়ম বেগম নিশ্চুপ ছিলেন। এবার তিনি বললেন–নূর যা বলছে তা সম্পূর্ণ সত্য। আমরা কোনোদিন ওদের কথা ভাবি না, ভাববার সময় হয় না কিন্তু ওরা না থাকলে আমাদের জীবন যাপন দুর্বিসহ হয়ে উঠতো। তাই ওদের কথা ভাবতে হয়। ওরা কেমন করে সভ্য মানুষের মতো বাঁচতে পারে এ নিয়ে চিন্তা করা প্রতিটি মানুষের উচিত।

এমন সময় ফোন বেজে উঠলো।

রিসিভার তুলে নিলো হাতে নূর–স্পিকিং নূরুজ্জামান। মিঃ আহম্মদ নিহত...... নূরের চোখেমুখে বিস্ময় ফুটে ওঠে, পুনরায় বলে.......আচ্ছা আমি এক্ষুণি আসছি।

বলে মনিরা–কি বললি নূর, মিঃ আহম্মদ নিহত?

নূর বললো—-হা আম্মু, কে বা কারা তাকে নিহত করেছে জানা যায়নি তবে তাকে নাকি তাঁর শোবার ঘরে নিহত অবস্থায় পাওয়া গেছে–কথাটা বলতে বলতে রিসিভার নামিয়ে রাখলো নূর।

মরিয়ম বেগম আড়ষ্ট হয়ে গেছেন যেন, তিনি দুচোখ কপালে তুলে বললেন–মিঃ আহম্মদ…পুলিশ প্রধান আহম্মদই নিহত হয়েছেন?

হাঁ, পুলিশ প্রধান মিঃ আহম্মদ তিনিই নিহত হয়েছেন। রাতে নয়, দিনের বেলা তার নিজের শয়নকক্ষে। সত্যি বড় আশ্চর্য।

কে তাকে এভাবে হত্যা করলো? চিন্তাযুক্ত কণ্ঠে বললো মনিরা।

বলা সম্ভব হচ্ছে না। মিঃ আহমদ কিছুদিন যাবৎ একা তার বাসভবনে বসবাস করছেন।

কেন তার স্ত্রী পুত্র কন্যা তারা কোথায়? বললো মনিরা।

নূর জবাব দিলো–কিছুদিন যাবৎ দেশে পাঠিয়ে দিয়েছেন সবাইকে।

আশ্চর্য!

হাঁ আম্মু, আশ্চর্য বটে। মিঃ আহম্মদ প্রখ্যাত পুলিশ সুপার ছিলেন। তার সুদক্ষ প্রচেষ্টায় বেশ কিছু অসৎ কুচক্রী এবং অসৎ ব্যবসায়িগণকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছিলো। এ ব্যাপারে আমি নিজেও তাকে সহযোগিতা করেছি।

বললেন মরিয়ম বেগম–এবার বুঝতে পেরেছি কেন তাকে মৃত্যুবরণ করতে হলো। কান্দাই শহরে দুস্কৃতিকারীরা কাজ করে সুবিধা করে উঠতে পারছিলো না, তাই…….

দাদীমা তোমার অনুমান সত্য তাতে কোনো সন্দেহ নেই। পরে তোমাদের সঙ্গে কথা বলবো এখন চলি? নূর উঠে দাঁড়ালো ব্যস্তসমস্ত হয়ে।

মরিয়ম বেগম বললেন–ইচ্ছা হচ্ছে আমরাও তোমার সঙ্গে যাই। বড় ভাল লোক ছিলেন মিঃ আহম্মদ।

মনিরা বললো–সাবধানে কাজ করিস নূর। জানি না তাকে কারা হত্যা করেছে.......তবে হত্যাকান্ড সাধারণ বা স্বাভাবিক নয়, সুপরিকল্পিতভাবে তাকে হত্যা করা হয়েছে বলে মনে হচ্ছে।

হাঁ, আমারও তাই মনে হয়। আম্মু তাহলে চলি। তারপর মরিয়ম বেগমকে লক্ষ্য করে বললো সে–দাদীমা, তোমার সঙ্গে আজ আর কথা বলা হলো না।

মরিয়ম বেগম চিন্তাযুক্ত কণ্ঠে বললেন–নতুন বিপদ এসে পথরোধ করে দাঁড়ালো নূর। অত্যন্ত সতর্কতা নিয়ে কাজ করবি দাদু।

নিশ্চয়ই মনে থাকবে তোমাদের নির্দেশ। সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেলো নূর।

*

নূর মিঃ আহম্মদের বাংলোর সম্মুখে পৌঁছতেই দেখলো বেশ কয়েকখানা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। কিছু লোক ভীড় জমিয়েছে বাংলোর সম্মুখে। নূরের মনটা হঠাৎ বিষণ্ন হয়ে পড়লো, কারণ গতকালকেই তাঁর সঙ্গে অনেক রাত পর্যন্ত ফোনে কথা হয়েছিলো।

এখনও নুরের কানে তার কণ্ঠের প্রতিধ্বনি হচ্ছে। তিনি শেষ কথা বলেছিলেন, মিঃ নর আপনি ছেলেমানুষ, সাবধানে কাজ করবেন, দেশ কুচক্রীদের অধীন হয়ে পড়েছে। কখন কোন দিক থেকে কোন বিপদ আসে বলা যায় না। অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে এগুতে হবে......

নূর হেসে বলছিলো–স্যার, এ ব্যাপারে আমি যথেষ্ট সজাগ, কাজেই আপনার মূল্যবান উপদেশ আমার মনে থাকবে।

নূর গাড়ি রেখে নেমে পড়লো।

দ্রুত সে প্রবেশ করলো মিঃ আহম্মদের বাংলোর মধ্যে।

মিঃ আহম্মদের শয়নকক্ষ দক্ষিণ পাশে।

কক্ষের দক্ষিণ দিক খোলা এবং জানালার ওপাশে সুন্দর পরিচ্ছন্ন বাগানে নানা ধরনের ফুলের সমারোহ। বড় সৌখিন ছিলেন মিঃ আহম্মদ। পুলিশ বিভাগে

কাজ করেও তার মন ছিলো যেমন উদার এবং মহৎ তেমনি কোমল।

তিনি কান্দাইয়ে বেশ কিছুদিন হলো অবস্থান করছেন। যদিও কয়েকবার তাকে কান্দাই হতে বদলির চেষ্টা করা হয়েছে তবুও তিনি ভাগ্যক্রমে রয়ে গেছেন। অবশ্য মিঃ আহম্মদ নিজেও চেষ্টা করেছিলেন এখানে থাকার জন্য। কারণ ছিল না যে তা নয়, কান্দাইয়ে বেশ কিছু অসৎ ব্যবসায়ী মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিলো, তারা নানা ভাবে দেশটাকে অধঃপতনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে, ব্যক্তিগত স্বার্থে অনেক নেতৃস্থানীয় লোক তাদের সহযোগিতা করে চলেছে।

নূর এসব ব্যাপারে অবগত ছিলো এবং আছে।

আর সে কারণেই নুরকে প্রায়ই মিঃ আহম্মদের কাছে আসতে হতো। মিঃ আহম্মদ দক্ষ পুলিশ সুপার ছিলেন। তিনি দীর্ঘ সময় কান্দাই অবস্থান করেছিলেন, তারপর তিনি চাকুরির ব্যাপারে বিদেশ যান এবং সেখান হতে ফিরে আবার তিনি কান্দাই আসেন। তাঁর জীবনের মূল লক্ষ্য ছিলো চাকুরির মাধ্যমে দেশ ও দেশের জনগণের খেদমত করা। তিনি সদালাপী ব্যক্তি ছিলেন।

নূর এলোমেলো চিন্তা করতে করতে কক্ষে প্রবেশ করলো। প্রবেশ করেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো নূর, বিছানায় মিঃ আহম্মদ নিদ্রিত অবস্থায় নিহত হয়েছেন। যেমন ঘুমিয়ে ছিলেন তেমনি আছেন, কে বা কারা তাকে গলা টিপে হত্যা করেছে।

মিঃ আহম্মদের শয্যার পাশে কয়েকজন পুলিশ অফিসার দাঁড়িয়ে ডায়রী লিখছেন। নূরকে দেখে তারা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, একজন এগিয়ে এসে বললেন– মিঃ নূর এ হত্যাকান্ড রহস্যজনক।

নূর শান্ত গলায় বললো–তা তো বটেই। কিন্তু হত্যাকান্ড কিভাবে সংঘটিত হলো, বিশেষ করে পুলিশ সুপারের বাংলোয়?

আশ্চর্য! এত পাহারার মধ্যে কিভাবে দুস্কৃতিকারিগণ বাংলোর অভ্যন্তরে প্রবেশ করলো তার কোনো হদিস পাওয়া যাচ্ছে না। কথাগুলো বললেন মিঃ হুদা।

মিঃ হুদা মিঃ আহম্মদের বিশিষ্ট বন্ধুলোক ছিলেন। যদিও তিনি এখন অবসরপ্রাপ্ত তবুও তিনি সব সময় পুলিশমহলে ঘোরাফেরা করেন। একদিন তিনি দক্ষ পুলিশপ্রধান ছিলেন। আপাতত তিনি কোনো ব্যবসার সঙ্গে জড়িত রয়েছেন।

মিঃ আহম্মদ তার বাল্যবন্ধু এবং চাকরিকালেও একসঙ্গে বহুকাল একত্রে কাজ করেছেন।

মিঃ আহম্মদ যখন কোনো জটিল কাজের সমাধান খুঁজে পেতেন না তখন তিনি মিঃ হুদার শরণাপন্ন হতেন। কারণ মিঃ হুদা এখন চাকরি থেকে অব্যাহতি পেলেও তার দৈহিক শক্তি এবং বলিষ্ঠ মনোবল তাকে সতেজ রেখেছিলো।

মিঃ হুদার সঙ্গে নূরের তেমন পরিচয় ছিলো না তবে মিঃ আহম্মদের বাংলোয় তাকে দেখেছেন, এবং তখনই মিঃ আহাদ নূরের সঙ্গে মিঃ হুদার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন।

মিঃ হুদার কথায় নূর কুঞ্চিত করে তাকালো তার দিকে।

মিঃ হুদার কথাগুলো আর একবার নিজের মনে আওড়িয়ে নিলো নূর। কোনো জবাব দিলো না সে তার কথায়।

এগিয়ে গেলো নূর মিঃ আহম্মদের প্রাণহীন দেহটার পাশে। স্থির দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে দেখতে লাগলো সে মিঃ আহম্মদের শান্ত গম্ভীর স্তব্ধ মুখমন্ডলের দিকে। এই মুখখানা গতকালই সবাক ছিলো, আর আজ নীরব। কালকেও মিঃ আহম্মদ তার কর্তব্যকাজে রত ছিলেন, আর আজ তিনি অবসর গ্রহণ করে চিরকালের জন্য বিদায় নিলেন। বড় সৎ মহৎ ব্যক্তি ছিলেন মিঃ আহম্মদ।

পুলিশ অফিসারগণ ডায়রী করছিলেন?

নূর এসে দাঁড়ালো বাইরে বেলকুনির পাশে। কক্ষের ভেতর দিয়ে একটি দরজা বেলকুনিতে চলে গেছে। নূর ঐ দরজা দিয়ে বাইরে বেলকুনিতে এসে দাঁড়ালো এবং ভালভাবে চারদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলো।

একদিন এই বেলকুনিতে বসে মিঃ আহম্মদের সঙ্গে অনেক রাত পর্যন্ত আলাপ আলোচনা হয়েছিলো প্রশাসনিক বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে। দুখানা হেনা চেয়ার এই বেলকুনিতে রক্ষিত ছিলো।

আজও ঠিক তেমনি আছে চেয়ার দুখানা।

ভারী বুটের শব্দে ফিরে তাকালো নূর, হঠাৎ দৃষ্টি বিনিময় হলো মিঃ হুদার সঙ্গে। তিনি একজরে তাকিয়ে আছেন নূরের দিকে।

নূর দেখলো ভারী বুটের শব্দ মিঃ হারুনের, তিনি ব্যস্তসমস্ত হয়ে আহম্মদ সাহেবের কক্ষে প্রবেশ করলেন।

নূরের সঙ্গে মিঃ হুদার দৃষ্টি বিনিময় হতেই মিঃ হুদা দৃষ্টি নত করে নিয়ে ফিরে দাঁড়ালেন।

নূর তাকালো বেলকুনির নিচে বাগানটার দিকে। নানা বিচিত্র বর্ণের ফুলের সমারোহ। মিঃ আহম্মদ বেলকুনিতে বসে বিশ্রামকালে এই বাগানের সৌন্দর্য উপভোগ করতেন। বাগানটার মধ্যে কোনো ক্লু পাওয়া যায় কিনা তাই লক্ষ করছিলো নূর।

হঠাৎ তার দৃষ্টি পড়ে হেলনা চেয়ারের পাশে ছোট্ট একটি বস্তুর ওপর। বস্তুটি অন্য কিছু নয় সিগারেটের টুকরা এবং তা রাতেই ব্যবহার করা হয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

নূর এবং সবাই জানে মিঃ আহম্মদ সিগারেট পান করতেন না কোনোদিনই। এ সিগারেট তাহলে দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি পান করেছিলেন এবং শেষ অংশটি সম্মুখস্থ টেবিলের এ্যাসট্রেতে নিক্ষেপ না করে চেয়ারের নিচে ফেলেছেন। অবশ্য ভুল করেও হতে পারে কিংবা ইচ্ছাকৃতও হতে পারে।

সিগারেটের টুকরাটা হাতে তুলে নিয়ে পকেটে রেখে ফিরে এলো নূর কমধ্যে।

মিঃ হারুন দক্ষ পুলিশ অফিসার। তিনি এ সংবাদ শুনে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছেন এবং ছুটে এসেছেন বাংলোতে। তিনি ভালভাবে আহম্মদ সাহেবের প্রাণহীন দেহ পরীক্ষা করে দেখতে লাগলেন।

মিঃ হুদাকে তিনি বললেন–হঠাৎ এমন একটা দুর্ঘটনা ঘটবে ভাবা যায়নি। কাল রাতেই তো মিঃ আহম্মদ আমার সঙ্গে ফোনে আলাপ করেছিলো। তখন রাত দশটা হবে।

নূর সামনে এসে দাঁড়ালো। ধূম পান

সালাম জানিয়ে বললো–নূর–স্যার, মিঃ আহম্মদ আমার সঙ্গেও রাতে ফোনে কথা বলেছিলেন, তখন রাত বারোটা হবে।

মিঃ হারুন উৎসুকভারে জিজ্ঞাসা করলেন–মিঃ নূর, কি কথা বলেছিলো আপনার সঙ্গে বলবেন কি?

নিশ্চয়ই!

বলুন?

নূর বললো–রাতে আমি নিজে একটু ব্যস্ত ছিলাম। তখনও শয্যা গ্রহণ করিনি এমন সময় ফোন বেজে উঠলো। আমি রিসিভার হাতে তুলে নিলাম। রাত তখন বাবোটা। রিসিভারে ভেসে এলো মিঃ আহম্মদের গলা।

তিনি কি বললেন?

কোনো একা কুচক্রী ব্যবসায়ীর সন্ধান তিনি পেয়েছেন, যাকে গ্রেপ্তার করা একান্ত দরকার এবং তার মালামাল বাজেয়াপ্ত করা উচিত বলে তিনি মনে করেন। রাতে এ ব্যাপারে তিনি আর কিছু জানাতে চাইলেন না। এমন কি সেই ব্যক্তির নামও তিনি বলেননি। আমার মনে হয় তিনি সেই ব্যক্তির নাম প্রকাশ করা এবং তার মালামাল বাজেয়াপ্ত করার পূর্বেই তাকে সরিয়ে ফেলা হলো।

গম্ভীর কণ্ঠে বললেন মিঃ হারুন–হাঁ, আপনি ঠিক বলেছেন মিঃ নুর।

মিঃ হুদা ব্যথাভরা কণ্ঠে বললেন–কু ব্যবসায়ীরাই দেশটাকে ধ্বংসের পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। কান্দাই শুধু নয়, সমস্ত পৃথিবী জুড়ে তারা নিজের প্রসার বিস্তারিত করেছে। শুধু আপনি আমি এ সব নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কি করবো বলুন?

নূর বললো–হাঁ, কথা ঠিক বলেছেন মিঃ হুদা। যে কারণে মিঃ আহম্মদ প্রাণ দিলেন। মিঃ হুদা, কাল আপনি যখন মিঃ আহম্মদের বাংলো হতে বিদায় নিলেন, তখন রাত কটা ছিলো?

আকাশ থেকে পড়লেন যেন মিঃ হুদা–কি বললেন মিঃ নূর আমি এই বাংলোয় গতকাল এসেছিলাম?

হাঁ, আপনি এসেছিলেন এবং রাতে এসেছিলেন।

আমি রাতে এসেছিলাম এ কথা কার কাছে শুনলেন?

আপনি মিঃ আহম্মদের বন্ধুলোক এবং হিতাকাঙ্ক্ষী। প্রায়ই আপনাকে তার বাংলোয় আমরা দেখেছি এবং আমি পৌঁছেও আপনাকে দেখলাম তাই...

তাই বলে আমি কাল রাতে এসেছিলাম সে কথা কে বললো বলুন?

আমি জানি আপনি কাল রাতে মিঃ আহম্মদের বাংলোয় এসেছিলেন।

সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা।

তাহলে আপনি কখন এসেছিলেন?

আপনি অহেতুক আমাকে বিরক্ত করছেন।

বেশ, আপনাকে আমি আর কোনো প্রশ্ন করতে চাই না।

তবে কি আপনি আমাকে কোনোরকম সন্দেহ.......

ছিঃ এমন কথা ভাববেন না। বললো নূর। তার চোখেমুখে মৃদু হাসির আভাস ছড়িয়ে পড়লো।

মিঃ হারুন এটা লক্ষ করলেন।

ইতিমধ্যে মিঃ শংকর রাও এসে উপস্থিত হলেন, তিনি তো অবাক হয়ে গেছেন এ সংবাদে। কিছুদিন পূর্বে পুলিশ সুপার মিঃ আহম্মদ রিজভী নিহত হয়েছিলেন কান্দাই ডাকবাংলো, আবার মিঃ আহম্মদ নিহত হলেন–সব যেন কেমন ঘোলাটে ব্যাপার।

মিঃ শংকরা রাও মিঃ হারুন এবং নূরকে আড়ালে ডেকে বললেন–আপনারা যাই বলুন ব্যাপারটা অত্যন্ত ঘোলাটে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিছুদিন পূর্বে মিঃ আহমদ রিজভীর হত্যাকান্ডোর সঙ্গে বিশেষভাবে এই হত্যাকান্ড সংযুক্ত রয়েছে বলে আমার ধারণা।

নানা ধরনের মন্তব্য হলো কিন্তু কোনো সমাধান কেউ করতে পারলেন না। লাশ মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করে সবাই ফিরে গেলেন।

*

বনহুর তার দরবারকক্ষের আসনে উপবিষ্ট। দেয়ালে দপদপ্ করে মশাল জ্বলছে। সম্মুখে দন্ডায়মান তার অনুচরগণ। সকলের হাতেই অস্ত্র এবং সবাই জমকালো ড্রেসে সজ্জিত।

বনহুরের দেহেও জমকালো পোশাক মাথায় কালো পাগড়ি।

মশালের আলোতে চকচক করছিলো তাদের দেহের পোশাক। বনহুরের আসনের পাশে দন্ডায়মান রহমান ও কায়েস। তাদের শরীরেও ঐ একই ধরনের পোশাক।

সবাই উদ্বিগ্নভাবে দাঁড়িয়ে আছে। সবার চোখেমুখে একটা উত্তেজনার ছাপ বিদ্যমান।

বনহুর বললো–আমি জানতাম আমার অবর্তমানে তোমরা ঠিকভাবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। আমি খুশি হয়েছি যে, তোমরা শায়েস্তা করেছো অসৎ কু ব্যবসায়ী রাজুসিং দেওয়ানকে। ওর ওপর আমার বহুদিনের রাগ ছিলো, কারণ সে শুধু কান্দাইবাসীদের সর্বনাশ করেনি, সর্বনাশ করেছে গোটা পৃথিবীর লোকের। দেওয়ান আমার ভয়ে আত্মগোপন করে ছিলো ঝম পর্বতের কোনো এক গুহায়……থাক ওসব কথা, এখন মিঃ হুদার যে মালামাল আজ হীরাঝিলের কোনো এক গেলাপন স্থানে সরানো হচ্ছে তার সম্বন্ধে বলো? কারণ এক্ষুণি আমরা রওয়ানা দেবো। হাঁ, আর একটি দুঃসংবাদ আছে যা তোমরা জানো না। পুলিশ সুপার, আহম্মদ তিনি গত রাতে নিহত হয়েছেন।

রহমান বলে উঠলো–মিঃ আহম্মদ নিহত হয়েছেন।

হাঁ এবং তার বাংলোর শয়নকক্ষে।

সর্দার, মিঃ আহম্মদ আপনাকে গ্রেপ্তার করা জন্য উন্মাদ হয়ে উঠেছিলেন। সরকার কয়েক লাখ টাকা ঘোষণা করেছিলেন, যে আপনাকে জীবিত অথবা মৃত পাকড়াও করে দিতে পারবে তাকে পুরস্কৃত করা হবে…….

এ কথা সত্য। মিঃ আহম্মদ ভুল করেননি, কারণ তার কর্তব্য তিনি পালন করার জন্য সচেষ্ট ছিলেন।

সর্দার।

হাঁ রহমান, আমি তাকে শ্রদ্ধা করি, কারণ তিনি অন্যায় কাজ করেননি। আমাকে গ্রেপ্তার করার নির্দেশ পেয়েছিলেন বলেই তিনি এ কাজে আগ্রহী ছিলেন। মিঃ আহম্মদ একজন সুদক্ষ পুলিশ প্রধান ছিলেন, যার দৃষ্টিকে ফাঁকি দেওয়া সহজ ছিলো না। একটু থেমে বললো বনহুর–তাঁকে হত্যা করা হলো সে কারণেই। দেশের বুকে বাস করে দেশবাসীর সর্বনাশ করা যাদের নেশা তারা তাকে সহ্য করতে পারলো না এবং সে কারণেই তাকে ঘুমন্ত অবস্থায় হত্যা করা হলো।

কায়েস বলে উঠলো–সর্দার, কে তাঁকে হত্যা করেছে?

সব জানতে পারবে তবে আজ নয়। তোমরা সবাই প্রস্তুত?

হ্যাঁ সর্দার।

মিঃ হুদার মালবোঝাই সাতখানা ট্রাক আজ রাত সীমান্তের ওপারে পাচার হবে। কোনমতেই এ মাল আমরা সীমান্তের ওপারে যেতে দেবো না।

একসঙ্গে বলে উঠলো সবাই–না, কিছুতেই দেবো না।

আচ্ছা, তাহলে তোমরা দরবারকক্ষ ত্যাগ করো। আমরা এক সঙ্গ দলবদ্ধভাবে যাবো না। বিভিন্ন পথে ঝাম পর্বতের পাদমূলে বিভিন্ন স্থানে আত্মগোপন করে থাকবো, তারপর যখন ট্রাকগুলো এক সঙ্গে ঐ পথ দিয়ে এগিয়ে আসবে তখন……মনে রেখো তোমরা, ট্রাকে শুধু মালামালই থাকবে না–থাকবে সশস্ত্র প্রহরী, যারা তোমাদের ওপর পাল্টা আক্রমণ চালাবে।

হাঁ, আমরা জানি সর্দার এবং সে কারণে প্রস্তুত আছি। কথাটা বললো রহমান।

বনহুর আর রহমান বেরিয়ে এলো দরবারকক্ষ থেকে।

বাইরে বেরিয়ে আসতেই সম্মুখে এসে দাঁড়ালো নূরী, বললো সে–একটি দিন তুমি বিশ্রাম নিলে না? রাতে এসেছে আর এক্ষুণি ভোর রাতেই চলে যাচ্ছো?

না গিয়ে যে উপায় নেই। জানো নূরী, ৪ কোটি টাকার মালামাল আজ সীমান্তের ওপারে চলে যাচ্ছে। যার জন্য হত্যা করা হলো প্রখ্যাত পুলিশ সুপার মিঃ আহম্মদকে। নূরী, এখন বাধা দিও না। তুমি জাভেদের দিকে লক্ষ রেখো, ও এখন স্বাভাবিক জ্ঞানসম্পন্ন নয়.......কথাটা বলে দ্রুত বেরিয়ে গেলো বনহুর।

নূরী স্থবিরের মত দাঁড়িয়ে রইলো।

একটু পরই শোনা গেলো অনেকগুলো অশ্ব পদশব্দ। নূরী বুঝতে পারলো বনহুর চলে গেলো তার দলবল নিয়ে।

একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো নূরী সন্তানের মুখের দিকে। বনহুর জাভেদসহ ফিরে এসেছে আজ। তার খুশির অন্ত নেই, সন্তানকে বহুদিন পর ফিরে পেয়ে হারানো মাণিক যেন ফিরে পেয়েছে নূরী। ছুটে গিয়ে জাভেদকে বুকে জড়িয়ে ধরতে গিয়েছিলো সে কিন্তু বনহুর বাধা দিয়ে বলেছিলো–ওকে কিছু সময় দাও নূরী।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিলো নূরী।

দুচোখে বিস্ময় নিয়ে একবার স্বামী তারপর সন্তানের মুখের দিকে তাকিয়েছিলো। সব যেন এলোমেলো লাগছিলো।

অবশ্য নূরী লক্ষ করেছিলো জাভেদ যেন পূর্বের সে জাভেদ নয়। তার চোখেমুখে অচেনা অজানার ভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। নূরীর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিলো জাভেদ।

বনহুর ওকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলো, ও তোমার মা, তোমার হিতাকাক্ষিী। কিন্তু জাভেদের মধ্যে কোনো পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়নি।

তারপর খাবার সময় বনহুরের পাশে এসেও খেয়েছিলো, তখনও নূরীর সঙ্গে কথা বলেনি।

সবচেয়ে বেশি আনন্দমুখর লাগছিলো ফুল্লরাকে। যদিও সে চট করে ওর সামনে আসতে পারেনি। একটা দ্বিধাদ্বন্দ্ব ফুল্লরার মনকে আরও বেশি পিছিয়ে

দিচ্ছিলো।

ফুল্লরা আড়াল থেকে প্রাণভরে দেখছিলো জাভেদকে। জাভেদ তার জীবন, জাভেদ তার প্রাণের চেয়েও প্রিয়। পূর্বের চেয়ে জাভেদআরও সুন্দর হয়েছে, যদিও সে বনে বনেই কাটিয়েছে এতদিন তবু তার চেহারায় এসেছে পৌরুষত্ব।

খুশিতে উচ্ছল ফুল্লরা। আকাশের চাঁদ যেন তার হাতের মুঠায় এসেছে।

নুরী সন্তানের শরীরে কম্বলটা টেনে দিয়ে বেরিয়ে এলো।

আলগোছে পা টিপে টিপে জাভেদের পাশে এসে দাঁড়ালো ফুল্লরা। এতক্ষণ সে আড়ালে আত্মগোপন করে ছিলো। চুপ চুপ করে ফুল্লরা প্রবেশ করেছিলো জাভেদের গুহায়, ওর শয্যার। পাশে এসে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলো ওকে। কতদিন দেখেনি সে জাভেদকে তাই সাধ মিটিয়ে ওকে দেখে নিচ্ছিলো।

বনহুর কাল রাতে ওকে নিয়ে এসেছে।

যখন শুনলো জাভেদ ফিরে এসেছে তখন আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েছিলো ফুল্লরা। মা নাসরিনকে বলেছিলো, মাগো, আজ আমার জীবনে আলো ফিরে এলো। তারপর লজ্জায় দুহাতে মুখ ঢেকে পালিয়ে গিয়েছিলো ফুল্লরা। হঠাৎ কথাটা মাকে বলে বড় লজ্জা পেয়েছিলো সে।

নাসরিন জানতো ফুল্লরা কেন দিন দিন এমন মনমরা হয়ে পড়েছে। কেন তার মুখে হাসি নেই। কেন সে বসে বসে গভীর ভাবে চিন্তা করে। হাজার চেষ্টা করেও নাসরিন কন্যার মুখে হাসি ফোঁটাতে পারতো না। বড় ব্যথা লাগতো নাসরিনের মনে। রহমানকে সে বলেছিলো ফুল্লরা সম্বন্ধে। যদি ওকে বাঁচাতে চাও তবে জাভেদকে খুঁজে আনো, নাহলে ফুল্লরা ফুলের মত শুকিয়ে এক দিন ঝরে পড়বে।

রহমান একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করা ছাড়া আর কিছুই বললো না। সে জানে জাভেদ হারিয়ে গেছে, তাকে আর কোনোদিন ফিরে পাওয়া যাবে না। অবশ্য তার মৌন থাকার পেছনে কারণ ছিলো, বহু সন্ধান করেও জাভেদকে পাওয়া যায়নি। এমন কি বনহুর নিজেও হতাশ হয়ে পড়েছিলো।

আজ সেই জাভেদসহ ফিরে এসেছে বনহুর।

অবশ্য রহমান আর বনহুর একত্রভাবেই বহুবার বহু দিন বনে জঙ্গলে শহরে প্রান্তরে দেশ হতে দেশান্তরে খুঁজে ফিরেছিলো, কিন্তু কোথাও খুঁজে পায়নি। আস্তানার সবাই নিরাশ হয়ে পড়েছিলো এমনকি নূরীও।

জাভেদ ফিরে আসায় আস্তানার সবাই খুশিতে আত্মহারা। এমন কি বৃদ্ধা দাইমা, যে এখন চোখে দেখে না কানেও তেমন শোনেনা, চলৎশক্তি রহিত সেও খুশি হয়েছে যখন ফুল্লরা তাকে বললো, জাভেদ ফিরে এসেছে। হাজার হলেও বৃদ্ধা দাইমার মায়া ছিলো কারণ কোলে–কাখে করে মানুষ করেছে সে ওকে। শুধু ওকে নয়, ওর মাকেও দাইমা কোলেপিঠে করে মানুষ করেছে।

জাভেদ ফিরে আশায় আনন্দে তার ঘোলাটে চোখ দুটো দীপ্ত হয়ে উঠেছিলো।

ফুল্লরা জড়িয়ে ধরেছিলো দাইমাকে খুশিতে উচ্ছল হয়ে। দাইমা বলেছিলো—-তা আমার সঙ্গে কেন, ওর সঙ্গে মিলিত হও, আমরা দেখি।

কিন্তু ফুল্লরা সোজাসুজি জাভেদের পাশে যেতে পারেনি, লজ্জা–সংকোচ তাকে সংকোচিত করে তুলেছিলো।

রাতের অন্ধকারে একাকী পা টিপে টিপে সে জাভেদের ঘরে এসেছে। অঘোরে ঘুমাচ্ছে। জাভেদ, ফুল্লরা ওকে প্রাণভরে দেখছে। শুনেছে ফুল্লরা জাভেদ নাকি স্বভাবিক জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে, সে নিজের কাউকে স্মরণ করতে পারে না। তাই ভয় ফুল্লরার যদি জাভেদ তাকেও চিনতে না পারে.......

যখন ফুল্লরা ভাবছিলো তখন বাইরে পদশব্দ শুনতে পেয়ে সচকিত হয়ে ওঠে এবং একটা থামের আড়ালে আত্মগোপন করে সে। দেখতে থাকে সে এই কক্ষে অসময়ে প্রবেশ করে।

ফুল্লরা জানতো এ সময় কেউ আসবে না কারণ এখন ভোররাত প্রায়। হঠাৎ কক্ষে প্রবেশ করলো নূরী, জাভেদের জননী।

ফুল্লরা কতকটা নিশ্চিন্ত হলো, সে ভেবেছিলো হয়তো বা অন্য কেউ হয় সর্দার নয় তার বাবা রহমান আসছে। যখন ফুল্লরা নূরীকে দেখলো তখন সে আগ্রহভরে দেখতে লাগলো।

নূরী এসে সন্তানকে জাগালো না। শুধু সে কিছুক্ষণ সান্ত্বনাপূর্ণ দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইলো, তারপর কম্বলখানা জাভেদের শরীরে টেনে দিয়ে বেরিয়ে গেলো।

এবার ফুল্লরা এগিয়ে এলো জাভেদের শয্যার পাশে। তাকিয়ে দেখলো সে দরজার দিকে। নূরী আর আসবে না, সে তার শয়নকক্ষের দিকে চলে গেলো।

ফুল্লরা পাশের প্রদীপটা তুলে ধরলো।

জাভেদ ঘুমিয়ে আছে নিশ্চিন্ত মনে।

ওপাশে একটি চন্দনের বাটি।

ফুল্লরা চন্দনের বাটি থেকে আংগুলে চন্দন নিয়ে অতি সাবধানে জাভেদের কপালে চন্দনের টিপ পরিয়ে দিলো। তারপর ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলো তার কক্ষ থেকে।

*

সর্দার, ট্রাক সহ মালামাল আটক করা হয়েছে। ট্রাকের চালকগণ এবং সশস্ত্র প্রহরী যারা মালগুলো রক্ষণাবেক্ষণ করে সীমান্তের ওপারে নিয়ে যাচ্ছিলো তাদের বন্দী করে আনা হয়েছে। এখন আপনার নির্দেশ পেলে আমরা সেইভাবে কাজ করব। কথাগুলো বললো রহমান।

বনহুর দেহ থেকে জমকালো পরিচ্ছদ খুলে রাখতে রাখতে বললো–ঝাম পর্বতের গুহায় গাড়িগুলো মালামাল সহ রেখে দাও। আর বন্দীগুলোকে চোখ বেঁধে হাজির করো দরবারকক্ষে।

বললো হরমান–সর্দার, আদেশ পালন হবে আপনার নির্দেশ মত। আমাদের দুজন নিহত হয়েছে, সর্দার।

লাশ দুটো এনেছো?

হা সর্দার। বললো কায়েস।

ওদের জন্য আমি দুঃখিত রহমান। মংলু আর হারুন আমার কম প্রিয় ছিলো না। ওদের দাফন কাফন করার ব্যবস্থা করো। তারপর আমি দরবারকক্ষে

আসছি।

আচ্ছা সর্দার। কথাটা বলে রহমান আর কায়েস বেরিয়ে গেলো।

বনহুর বসলো একটা আসনে।

তার সমস্ত দেহ ঘর্মাক্ত। মুখমন্ডলে চিন্তাযুক্ত।

রহমান আর কায়েস বেরিয়ে যেতেই নূরী প্রবেশ করলো সেখানে। বললো নূরী বনহুরকে। লক্ষ্য করে–দেখলে, দুজনকে হারালে তো?

বনহুর দৃষ্টি তুলে ধরলো নূরীর মুখের দিকে।

নূরী বনহুরের কপাল থেকে চুলগুলো সরিয়ে দিতে দিতে বললো–মংলু আর হারুন কত সাহসী আর সৎ ছিলো। যদি তোমার কিছু হতো তাহলে......

নূরী, আমার কিছু হলে দুঃখ ছিলো না, দুঃখ হারুন আর মংলুকে আমরা হারালাম। একটু থেমে বললো বনহুর–তবে দুঃখ করে লাভ হবে না। কারণ আমরা মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়েই এ কাজে অগ্রসর হয়েছি। তা ছাড়া মরতে যখন একদিন হবেই বীরের মত মরাটাই শ্রেয়। হারুন আর মংলু বীরের মত মরেছে। দেশের সম্পদ যখন বাইরে পাচার হয়ে যাচ্ছিলো তখন আমরা তা রোধ করতে গিয়েছিলাম। কারণ দেশ আর দেশের জনসাধারণকে নিঃশেষ করে স্বার্থান্বেষী পুঁজিপতিরা নিজেদের ভবিষ্যৎ গড়ে নিচ্ছে আমরা তা হতে দেবো না এবং এ জন্য আমাদের ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। নূরী, জাভেদ কেমন আছে?

ভাল আছে। তবে সে কারও সঙ্গে কথা বলছে না। এমন কি আমাকেও সে চিনতে পারেনি। সত্যি আমার বুক ফেটে কান্না আসছে......গলা ধরে আসে নূরীর।

কোথায় ও

ঝরণার ধারে বসে আছে।

একা ওকে থাকতে দিও না নূরী।

জানি ও কোন ফাঁকে আবার পালিয়ে যাবে। তাই আমি রমজানকে ওর পাশে সব সময় থাকতে বলেছি।

চমকে উঠলো বনহুর–কি বললে নূরী, রমজানকে জাভেদের পাশে রেখেছো। ওকে যে এতক্ষণ সে হত্যা করে পালায়নি কে জানে। তাড়াতাড়ি জমাটা বনহুর গায়ে পরতে লাগলো।

নূরী বললো–জাভেদ রমজানকে হত্যা করতে পারে এমন চিন্তাধারা তোমার মাথায় কেমন করে এলো?

একটু হেসে বললো বনহুর–জাভেদ আমাকেও হত্যা করতে গিয়েছিলো। সে অনেক কথা, চলো দেখে আসি রমজান জীবিত আছে কিনা।

বনহুর আর নূরী বেরিয়ে এলো বাইরে।

তারা ঝরণার দিকে এগুলো।

কিছুটা এগুতেই শুনতে পেলো নুপুরের শব্দ।

বনহুর তবু এগিয়ে যাচ্ছিলো।

নূরী ওর হাত ধরে ফেললো।

ফিরে তাকালো বনহুর নূরীর দিকে। দুচোখে তার অশ্রু, হঠাৎ নূরী তাকে থামতে বললো কেন?

নূরী ঠোঁটে আংগুল চাপা দিয়ে বললো–চুপ। তারপর আংগুল দিয়ে দেখিয়ে দিলো ঝরণার অদূরে।

বনহুর দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো, সে দেখতে পেলো জাভেদ বসে আছে একটা পাথরখন্ডের ওপর আর ফুল্লরা নাচছে। সে আপন মনে নেচে চলেছে।

জাভেদ বিস্ময়ভরা দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে।

হঠাৎ একটা ঝোঁপ নড়ে উঠলো।

বনহুর আর নূরী ফিরে তাকালো।

অবাক হয়ে দেখলো ওরা রমজান ঝোঁপটার মধ্যে গুটিসুটি মেরে বসে আছে।

নূরী আর বনহুরকে দেখে বেরিয়ে এলো ঝোঁপের ভিতর হতে রমজান। ঘেমে নেয়ে উঠেছে সে, বনহুরকে দেখে ভীতভাবে বললো রমজান–আমি....মানে আমি লুকিয়ে লুকিয়ে পাহারা দিচ্ছিলাম সর্দার। কারণ ছোট সর্দার আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলো। আমি মিথ্যা বলছি না, আমাকে ঘুষি মারতে চেয়েছিলো.......

নূরী হেসে বললো–ও ভালই বুদ্ধি করে নিয়েছিলো। এই ঝোঁপটার মধ্যে আত্মগোপন করে সে লক্ষ রেখেছিলো যেন জাভেদ পালাতে না পারে।

বনহুর শুধু একটু হাসলো।

নূরী বললো–রমজান, তুই যা, আমরা ওকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবো।

রমজান এতক্ষণ ঝোঁপটার মধ্যে লুকিয়ে থেকে বড় অস্বস্তি বোধ করছিলো, নূর য় খুশি হয়ে সে চলে গেলো।

নূরী এবার আংগুল দিয়ে দেখিয়ে দিলো–দেখো হুর, তোমার সন্তান আর ফুল্লরাকে দেখো।

ফুল্লরা আপন মনে নেচে চলেছে আর জাভেদ অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে। অদ্ভুত সে নাচ, জাভেদের দুচোখে বিস্ময় ঝরে পড়ছে।

নূরী বললো–জাভেদ এবার ফুল্লরাকে আর বিমুখ করে তাড়িয়ে দেবে না। হয়তো ফুল্লরা ওর স্বাভাবিক সংজ্ঞা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হবে।

বললো বনহুর–তুমিও তো একদিন এমনি করে আমাকে.......আমার অস্তিত্ব হতে ফিরিয়ে এনেছিলো। আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম আমার সত্ত্বা........

হুর! তুমি এমন কথা বলতে পারলে। আমি তোমার সংজ্ঞা বিলুপ্ত করে দিয়ে ছিলাম?

হেসে বললো বনহুর–নাহলে তুমি আমার জীবনে এলে কি করে?

তুমি আমাকে তাহলে চাওনি কোনোদিন?

এসব পুরোনো কথা নাইবা তুললে নূরী।

তাহলে....

ঐ দেখো জাভেদ চলে যাচ্ছে। নূরী, ওকে ধরে আন?

নুরী তাকালো সেইদিকে।

ফুল্লরার নাচ থেমে গেলো।

জাভেদ পাথরাসন ত্যাগ করে অপরদিকে পা বাড়িয়েছে। ফুল্লরা ছুটে আসছে ওর দিকে।

নূরী বললো–আমার কথা জাভেদ শুনবে না। তুমি যাও হুর। তোমার সন্তানকে সামলাও।

বনহুর এগিয়ে গেলো।

পথরোধ করে দাঁড়ালো জাভেদের।

ফুল্লরা বনহুর আর নূরীকে দেখে লজ্জিত হলো। সে ছুটে পালিয়ে গেলো আস্তানা অভিমুখে।

বনহুর সামনে দাঁড়াতেই জাভেদ চোখ দুটো নত করে নিলো। সে অপর দিকে পা বাড়াতেই বনহুর বললো–এসো আমার সঙ্গে।

এবার জাভেদ বাধ্য ছাত্রের মত বনহুরের সঙ্গে এগিয়ে চলল।

*

বিচারকক্ষ।

বনহুর তার জমকালো পোশাকে সজ্জিত।

রহমান এবং কায়েস তার পাশে দন্ডায়মান। দুপাশে বনহুরের অনুচরগণ সারিবদ্ধভাবে অস্ত্র হাতে দাঁড়িয়ে আছে।

গুহার দেয়ালে দপ দপ করে মশালগুলো জ্বলছে। মশালের লাল আলো ছড়িয়ে পড়েছে গুহার মধ্যে চারপাশে।

বনহুরের মুখের অর্ধেক অংশ আজ পাগড়ির আঁচলে ঢাকা। কারণ আজ বাহিরের কিছু বন্দী রয়েছে দরবার–গুহায়। বনহুর নিজের মুখের আবরণ কোনো সময় বন্দী অথবা বাইরের মানুষের সামনে উন্মোচন করে না, আজও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

বন্দীদের হাত পিছমোড়া করে বাধা।

সবার গলায় এক একটি নেম কার্ড ঝুলছে।

বনহুর এবার বন্দীদের লক্ষ্য করে বললো–তোমাদের মধ্যে অনেকেই অনুধাবন করতে পেরেছে তোমরা এখন কোথায় এবং কি অবস্থায় আছ।

বন্দীগণ নিরুত্তর।

সবাই বিস্ময়ভরা চোখে তাকিয়ে আছে জমকালো পোশাক পরিহিত বনহুরের মুখমন্ডলের দিকে। তারা শুধু চোখ দুটো এবং কপালের কিছু অংশ দেখতে পাচ্ছে, আর কিছু নয়। প্রত্যেকের মুখে ভয়ার্ত ভাব পরিষ্কার পরিলক্ষিত হচ্ছে।

বনহুর কঠিন এবং গম্ভীর গলায় পুনরায় বললো–এসব মালামাল তোমরা কোথায় নিয়ে যাচ্ছিলে এবং এ মাল কার, তোমাদের বলতে হবে।

একজন বললো—-যদি আপনি আমাদের মুক্তি দেন তাহলে আমরা সব জানাবো।

বনহুর বললো–বিবেচনা করে দেখবো মুক্তি দেওয়া যায় কিনা তারপর...... কিন্তু মনে রেখো, একচুল মিথ্যা বললে মৃত্যু তোমাদের জন্য অবধারিত.......বলো এ মালামাল কার এবং কোথায় নিয়ে যাচ্ছিলো তোমরা?

অপর একজন ভয়বিহ্বল কণ্ঠে বললো–সব সত্য বলবো। আমরা টাকার দাস, আমরা চাকরি করি। মালিকের হুকুম মেনে চলি। অপরাধ আমাদের নয়.......

জানি আর সে কারণেই তোমাদের এখনও হত্যা করা হয়নি।

আর একজন বললো–আমরা নিজেরাও এ ব্যাপারে ব্যথিত দুঃখিত কিন্তু উপায়হীন আমরা। হুকুমের দাস তাই.......।

কে তুমি? কি তোমার পরিচয়? শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে বললো বনহুর।

লোকটার বাম হাতের বাজুতে গুলীবিদ্ধ হয়েছিলো, ব্যথা আর যন্ত্রণায় কাতর তার মুখমন্ডল, বললো সে–আমার তেমন কোনো পরিচয় নেই। আমি একজন সাধারণ মানুষ। লেখাপড়া শিখেছিলাম মানুষের মত বাঁচবো বলে কিন্তু........এক গেলাস পানি যদি পেতাম, উঃ! বড় কষ্ট!

বনহুর বললো–কায়েস, ওকে এক গেলাস পানি দাও? আর ওর হাতের বাঁধন মুক্ত করে দাও।

বনহুর বুঝতে পারলো ওর হাতে গুলীবিদ্ধ হওয়ায় হাতখানা আহত এবং পিছমোড়া করে বাধায় আরও কষ্ট হচ্ছে। তাই সে ওর হাত দুখানা মুক্ত করে দেবার জন্য নির্দেশ দিলো।

লোকটার হাত দুখানা মুক্ত করে দেয়া হলো।

ঠান্ডা পানি প্রাণভরে পান করলো সে, তারপর বলে চললো–কিন্তু সমাজ শাসন আমাকে মানুষের মত বাঁচতে দিলো না। বাড়িতে স্ত্রী–ছেলে–মেয়ে, বৃদ্ধ মা–বাপ–তাদের মুখে ঠিকমত আহার তুলে দিতে পারতাম না। লেখাপড়া শেখাতে বাপ–মা নিঃস্ব হয়ে পড়েছিলো–বড় আফসোস, লেখাপড়া শিখেও কিছু করতে পারিনি। সমাজশাসন আমাকে ঠেলে দিলো অসৎ কাজে আত্মনিয়োগ করতে। জানি না আপনি কে, কোন্ মহান পুরুষ। আপনার এই গুহা দেখে আমার যে ধারণা তা সত্য কি না জানি না, আপনি সাধারণ ব্যক্তি নন। আপনার বুকেও এত দয়া অথচ যারা আজ সমাজের মূলস্তম্ভ হিসেবে নিজেদের দাবি করে তারা বড় হৃদয়হীন। আজ আমার অধঃপতনের জন্য দায়ী তারা.......যন্ত্রণায় লোকটা মুখ বিকৃত করলো তারপর আবার বলতে শুরু করলো–দেশের সমাজপতিরা সমাজের দোহাই দিয়ে দেশ ও দশের সর্বনাশ করছে যেমন করেছে। আমার।

বনহুর বললো–তোমাদের অধঃপতনের জন্য তোমরাই দায়ী, কারণ তোমরা সমাজপতিদের প্রশ্রয় দিচ্ছে।

আমরা উপায়হীন অসহায় মানুষ, তাই নীরবে সহ্য করতে হয় সমাজপতিদের নিষ্ঠুর আচরণ। চাকরির জন্য দ্বারে দ্বারে গিয়েছি কিন্তু কেউ মুখ তুলে তাকায়নি–কারণ আমার সামর্থ্য ছিলো না যে তাদের খুশি করি। সবাই অর্থের লালসায় হা করে থাকে। বলুন আমার যদি তাদের খুশি করার মত অর্থ থাকতো তাহলে কি আমি যেতাম তাদের পদসেবা করতে? স্বাধীনভাবে ব্যবসা করতাম, এবং সুখে বাবা–মা, স্ত্রী–পুত্র–কন্যা নিয়ে সভাবে দিন যাপন করতাম.......কিন্তু সব আমার নষ্ট হয়ে গেলো...লোকটা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো।

বনহুর বললো–হা সব শুনলাম এবং বুঝলাম। রহমান, যাও এদের বন্দীখানায় বন্দী করে রাখো তারপর বিচার হবে। যারা আহত তাদের চিকিৎসার যেন ত্রুটি না হয়।

বেরিয়ে গেলো বনহুর।

রহমানকে লক্ষ্য করে বললো কায়েস–ব্যাপার কি, সর্দার এমনভাবে বেরিয়ে গেলো কেন? শুনলোনা এ মালামাল কার এবং তা কোথায় যাচ্ছিলো।

সর্দার এ ব্যাপারে তোমার আমার চেয়ে বেশি জ্ঞান রাখেন। তিনি সব জেনে নেবেন।

অবশ্য রহমানের কথা সত্য, বনহুর যা জেনে নিলো তা যথেষ্ট এবং মালামাল কার তাও কিছুটা আন্দাজ করে নিতে সক্ষম হয়েছে। বাকীটুকু জানার জন্য তার সময় লাগবে।

কান্দাই পর্বতমালা চারপাশে দেয়ালের মত মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। একটা বড় পাথরখন্ডের ওপর পা রেখে বনহুর নির্দে দিচ্ছে।

সামনে মাল বোঝাই ট্রাকগুলো।

রহমান এবং আরও কিছু অনুচর বনহুরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। সবাই আগ্রহ সহকারে শুনছে তার কথাগুলো। ট্রাকগুলো সম্বন্ধে কেউ জানে না কোথায় আছে সেগুলো। বনহুর বললো–রহমান, প্রতিদিন এক ট্রাক করে মাল যে

কোনো বস্তি এলাকায় নিয়ে যাবে এবং বিলিয়ে দেবে নিঃস্ব রিক্ত মানুষগুলোর মধ্যে। মনে রেখো, তোমাদের শরীরে থাকবে পুলিশ ড্রেস। কেউ যেন বুঝতে না পারে এ মালামাল সরকারি নয়। যেন তোমরা সরকারের লোক হিসেবে রিলিফ দিচ্ছো।

আপনার আদেশ পালনে কোনো ত্রুটি হবে না সর্দার। মালামালগুলো আমরা ঠিকভাবে এবং ঠিক জায়গায় পৌঁছে দেবো। বললো রহমান।

বনহুর তাজের পিঠে উঠে বসলো।

কান্দাই পুলিশ অফিস।

নির্জন একটি কক্ষে আলোচনা হচ্ছিলো। সেখানে রয়েছেন মিঃ হারুন, পুলিশ অফিসার মিঃ জামান, মিঃ শংকর রাও, নূর ও মিঃ লোদী।

কক্ষে নীলাভ আলো জ্বলছে।

সামনের টেবিলে এ্যাসট্রে, তার মধ্যে রয়েছে অর্ধদগ্ধ কিছু সিগারেট। কয়েকটি ফাইল এবং কিছু কাগজপত্র।

মিঃ হারুনের সামনে মিঃ আহম্মদের হত্যাকান্ডের রিপোর্ট। মিঃ হারুন রিপোর্টখানা মনোযোগ সহকারে দেখছিলেন।

অন্যান্য সবাই নীরব।

মাঝে মাঝে কথা হচ্ছিলো।

একটা ভাবগম্ভীর পরিবেশ সমস্ত কক্ষটাকে কেমন যেন থমথমে করে তুলেছিলো।

এলোমেলোভাবে সিগারেটের ধোয়া ছড়িয়ে পড়ছে কক্ষটার মধ্যে চারপাশে।

মুখ তুললেন মিঃ হারুন–রিপোর্টে বলা হচ্ছে মিঃ আহম্মদকে ঘুমন্ত অবস্থায় গলা টিপে হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু হত্যাকারী অত্যন্ত সতর্ক এবং চতুর, হত্যার পূর্বে সে হাতে রুমাল বা ভোয়ালে জড়িয়ে নিয়েছিলো যার জন্য নিহত মিঃ

আহম্মদের গলায় কোনো আংগুল বা হাতের ছাপ পরিলক্ষিত হয়নি। এ কারণে খুনীকে চিনে বের করা মুস্কিল হবে।

নূর হেসে বললো–খুনী যত সতর্কই হোক না কেন সে কোনো না কোনো ক্লু

রেখে যাবেই। অবাক চোখে তাকালেন সবাই তরুণ ডিটেকটিভ নূরের মুখের দিকে। তবে কি মিঃ নূর কোনো ক্লু পেয়েছেন।

বললেন মিঃ জামান–আমরা আশা করছি আপনি খুনীর ব্যাপারে কিছুটা নিশ্চিন্ত।

তবে সম্পূর্ণ নই মিঃ জামান। বললো নূর।

এসম সময় হন্তদন্ত হয়ে কক্ষে প্রবেশ করলেন মিঃ হুদা। তার চোখেমুখে একটা ভীষণ উদ্বিগ্নতার ছাপ বিদ্যমান। তিনি কক্ষে প্রবেশ করে বললেন–সর্বনাশ হয়ে গেছে মিঃ হারুন। আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে।

মিঃ হারুন এবং অন্যান্য সকলে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন। ব্যাপার কি, এত রাতে হঠাৎ মিঃ হুদা পুলিশ হেড অফিসে। তবে কি মিঃ আহম্মদের হত্যাকারীর কোনো সন্ধান পেয়েছেন তিনি।

মিঃ লোদী বিজ্ঞ লোক, তিনি বললেন–বসুন। ব্যাপার গুরুতর কিছু মনে হচ্ছে। মিঃ আহম্মদের হত্যাকারীর সন্ধান পেয়েছেন কি?

ঢোক গিলে বললেন মিঃ হুদা–আমি........না না, হত্যাকারীর সন্ধান আমি পাবো কি করে?

আপনি তার বন্ধুলোক এবং যখন তার বাংলোয় আপনাকে দেখা গেছে কাজেই আপনি তাঁর সম্বন্ধে ভাল বলতে পারবেন.....

মিঃ নূর, আপনি বড্ড হেয়ালী করে কথা বলেন। মনে রাখবেন, আহম্মদকে আমি নিজের ভাইয়ের মত মনে করতাম। ওর মৃত্যু আমার বুকের পাঁজর ভেঙে দিয়ে গেছে। রুমালে চোখ মুছলেন মিঃ হুদা, তারপর বললেন–একেই আমি আহম্মদের মৃত্যুতে শোকে মুহ্যমান তারপর আবার আমার মাথায় বজ্রপাত হয়েছে।

মিঃ হারুন বললেন–কি বলছেন মিঃ হুদা, আপনার মাথায় বজ্রপাত.......

হা মিঃ হারুন, আমার কয়েক কোটি টাকার মালামাল..

বলুন থামলেন কেন? জাহাজলুট হয়েছে বুঝি? না কোনো দুর্ঘটনায় আপনার....

কয়েক ট্রাক মালামাল যাচ্ছিলো, হঠাৎ গত পরশু রাতে সব মালামাল সহ ট্রাকগুলো দস্যগণ লুট করে নেয়।

বলেন কি মিঃ হুদা? বললেন মিঃ লোদী।

হাঁ.......আমি নিঃস্ব হয়ে পড়েছি মিঃ লোদী। অতি কষ্টে কষ্ট দিয়ে তার কথা কটি যেন বেরিয়ে এলো।

বললেন মিঃ জামান–আপনি গতকাল এটা জানাননি অথচ আজ রাতে আপনি জানাতে এসেছেন মিঃ হুদা?

বললেন মিঃ হুদা–আমার মালামাল লুট হয়েছে এ সংবাদ জানতে পারলাম আজ। আমার সবকিছু হারিয়ে ফেলেছি। আপনাদের সাহায্য আমার একান্ত প্রয়োজন। মিঃ হুদা রুমালে চোখ মুছলেন।

মিঃ জামান বললেন–সব কিছু খুলে বলুন মিঃ হুদা।

মিঃ হারুন বললেন–হাঁ, আপনি ডায়রী করুন।

মিঃ শংকর রাও বললেন–আপনার মালামালসহ ট্রাকগুলো কোন পথে কোথায় যাচ্ছিলো এবং ট্রাকগুলোতে কি মালামাল ছিলো সব পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করুন।

মিঃ হুদা বারবার রুমালে চোখমুখ মুছে নিচ্ছিলেন। তিনি আসল ব্যাপার গোপন রেখে বললেন–আমার কয়েক ট্রাক মালামাল মূল্যবান ফুড, কাপড় এবং শিশুখাদ্য কান্দাই হতে কান্দাইর দক্ষিণ এরিয়ায় যাচ্ছিলো। যখন কান্দাই জঙ্গলের পথের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলো তখন অকস্মাৎ দুবৃত্ত দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং সমস্ত মালামাল সহ ট্রাকগুলো তারা নিয়ে যায়। ট্রাকগুলোর ডাইভার এবং কিছু

প্রহরী ছিলো, তাদের পাকড়াও করে নিয়ে গেছে। কথাগুলো বলতে গিয়ে কেমন যেন নার্ভাস হয়ে পড়েছিলেন মিঃ হুদা।

এবার জামান শাহেব বলে উঠলেন–এ কাজ দস্যু বনহুর ছাড়া আর কারও নয়।

বললেন মিঃ লোদী–বনহুরের উপদ্রব পুনরায় শুরু হলো তাহলে? বহুদিন বনহুরের কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি।

হাঁ, ঠিকই বলেছেন মিঃ লোদী, বহুদিন বনহুরের সাড়া পাওয়া যায়নি সত্য তবে অন্যায় অনাচার এবং দুর্নীতিতে দেশ ভরে গিয়েছে এ কথাও অস্বীকার করা যায় না এবং পুলিশমহল অনেক চেষ্টা চালিয়েও এর কোনো সমাধান করতে পারেনি। কথাগুলো বললেন শংকর রাও।

নূর শুনে যাচ্ছিলো নিশ্চুপ, এবার সে চোখ তুললো। দস্যু বনহুরের আবির্ভাব, তবে কি সত্যি তার আব্বু কান্দাই এসেছেন। বিপুল আগ্রহ জাগলো তার মনে।

মিঃ হুদা ব্যপাকাতর ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললেন–আপনাদের সাহায্য আমার একান্ত প্রয়োজন। এ কাজ দস্যু বনহুর ছাড়া কারও নয়। যেমন করে হোক তাকে গ্রেপ্তারের কথা ঘোষণা করুন। সরকার পাঁচ লক্ষ টাকা ঘোষণা করেছেন, আমি নিজে আরও পাঁচ লক্ষ টাকা দেবো যে এই দস্যকে জীবিত অথবা মৃত এনে দিতে পারবে।

বললেন মিঃ হারুন–যেভাবে আপনি রিপোর্ট করলেন তাতে মনে হয় এ কাজ দস্যু বনহুর ছাড়া আর কারও নয়। মিঃ হুদা, আপনার এ ক্ষতির জন্য আমরাও ভীষণ দুঃখিত। আপনি এখন বাসায় যেতে পারেন। আমরা যথাযথভাবে চেষ্টা করবো যাতে আপনার মালামালসহ ট্রাকগুলো উদ্ধার করা সম্ভব হয় এবং যারা অপহৃত হয়েছে তাদের উদ্ধারের চেষ্টাও করা হবে। তারপর আপন মনে বললেন মিঃ হারুন–মিঃ আহম্মদের হত্যাকান্ড আমাদের ভীষণ ভাবিয়ে তুলেছে। কে বা কারা তাকে হত্যা করেছে এখনও কোনো ক্লু পাওয়া যায়নি।

মিঃ হুদা একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললেন–বন্ধুকে হারিয়ে আমি শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েছি, তারপর আবার আমার ললাটে এই দুর্ভোগ ছিলো। কথাগুলো বলে উঠে দাঁড়ালেন মিঃ হুদা।

সকলের সঙ্গে করমর্দন করে বিদায় গ্রহণ করলেন তিনি।

সেদিন আর আলোচনা বেশিদূর এগুলো না। সবাই নিজ নিজ বাসার দিকে গমন করলেন।

মিঃ হুদা চলেছেন তার নিজ গাড়িযোগে বাসভবনে। হঠাৎ মিঃ হুদা লক্ষ্য করলেন তার মোটরখানা বাসভবনের পথে না এগিয়ে অন্য পথে দ্রুত এগুচ্ছে।

এতক্ষণ তিনি অন্য চিন্তায় বিভোর ছিলেন। হঠাৎ সজাগ হয়ে বসলেন এবং ড্রাইভারকে লক্ষ্য করে বললেন–এ কোন রাস্তায় আমাকে নিয়ে চলেছো ড্রাইভার?

ড্রাইভার যেমনভাবে সামনে দৃষ্টি রেখে গাড়ি চালাচ্ছিলো তেমনি চালিয়ে চলেছে। মিঃ হুদার প্রশ্নের জবাবে বললো–ঠিক পথেই চলেছি স্যার।

ওর কথায় মিঃ হুদা সন্তুষ্ট হতে পারলেন না তিনি বললেন–এখন রাত অনেক কাজেই ঠিক পথে গাড়ি নেওয়া ভাল।

হাঁ স্যার, ভাল বলেই তো এ পথে নিয়ে এলাম। কারণ ও পথ আর আপনার জন্য নয়।

কারণ?

একটু পরই জানতে পারবেন।

ড্রাইভার!

বলুন?

তুমি কি আমার সঙ্গে তামাসা করছো?

স্যার, আমার এমন দুঃসাহস বা সময় নেই যে, আপনার সঙ্গে তামাসা করবো।

বলো কি ড্রাইভার? তোমার কথাগুলো কেমন যেন হেঁয়ালিপূর্ণ মনে হচ্ছে।

পথ জনহীন, কাজেই গাড়িখানা স্পীডে চলছিলো।

মিঃ হুদার মুখমন্ডল কেমন যেন ফ্যাকাশে হয়ে ওঠে। ড্রাইভার তার সঙ্গে এমন ধরনের ব্যবহার করবে ভাবতে পারেনি। তবে কি ইয়ার আলী ড্রাইভার নয়। মিঃ হুদার বেশ কয়েকখানা কার আছে। এক একটি গাড়ির ড্রাইভার এক একজন। মিঃ হুদার গাড়িখানা চালায় ড্রাইভার ইয়ার আলী। অনেক দিনের পুরানো ড্রাইভার ইয়ার আলী, বিশ্বাসীও বটে।

আজ ইয়ার আলীর কণ্ঠস্বর আলাদা মনে হচ্ছে। দাড়িভরা মুখখানায় লাইটপোষ্টের আলোর রশ্মি পড়ে মাঝে মাঝে কেমন যেন রহস্যময় লাগছে।

হঠাৎ একটি নির্জন স্থানে গাড়িখানা ব্রেক কষে থেমে পড়লো।

মিঃ হুদা চমকে উঠলেন।

ড্রাইভার আসন ত্যাগ করে নেমে পড়েছে ততক্ষণে।

মিঃ হুদার সামনে এসে বললো–নেমে আসুন মিঃ হুদা।

একি, এ কণ্ঠ তো সম্পূর্ণ অপরিচিত। মিঃ হুদা গাড়ির পেছন আসন থেকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন ড্রাইভারের মুখের দিকে।

চমকে উঠলেন আরও ভীষণভাবে, দেখলেন ড্রাইভারের হাতে রিভলভার।

লাইটপোষ্টের স্বল্প আলোতে রিভলভার হাতে ড্রাইভারকে যমদূতের মতো মনে হলো মিঃ হুদার কাছে। চোখ ঝাপসা হয়ে আসছে তার। তবে কি ড্রাইভার ইয়ার আলি নয়। কিন্তু.......

চিন্তাধারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল মিঃ হুদার।

বাধ্য হলেন তিনি গাড়ি থেকে নেমে আসতে। গাড়ির পেছন দরজা বাম হাতে খুলে ধরলো ড্রাইভার, দক্ষিণ হাতে তাক করা রয়েছে রিভলভার।

মিঃ হুদা খুব ভীত হয়ে পড়লেন কারণ, আশেপাশে কোনো লোকালয় নেই। যে স্থানে গাড়ি খানা দাঁড় করানো হয়েছে সেটা একটা নির্জন পথ।

কিছু দূরে লাইটপোষ্টগুলো নির্ম্নপ প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে আছে। যেন ওরা নীরব পাহারাদার।

মিঃ হুদা কোটিপতি।

তার জীবন সুখের।

হাজার হাজার শ্রমিক তার ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করে। এমন কোনো ভয় তাঁর ছিলো না যে কোনো শ্রমিক তার ওপর হামলা চালায়। কারণ শ্রমিকগণ তাকে হিংস্র জন্তুর মত ভয় করতো। একটা টু শব্দ করার মত কারও সাধ্য ছিলো না। মিঃ হুদার দুচোখে বিস্ময়, রাগ ফুটে উঠলো। কিন্তু কোনো কথা না বলে নেমে এলেন গাড়ি থেকে।

ড্রাইভার রিভলভার চেপে ধরলো মিঃ হুদার বুকে, তারপর বললো–আপনি মিঃ আহম্মদকে হত্যা করেছেন?

কে তুমি! তুমি ইয়ার আলী নও?

না।

তবে কে তুমি?

আমি যেই হই না কেন, আমার প্রশ্নের জবাব দিন? বলুন, যদি সত্যি কথা না বলেন তাহলে মিঃ আহম্মদের মতই অবস্থা হবে আপনার।

তুমি কি আমাকে হত্যা করবে?

বন্ধুকে হত্যা করেছে, কাজেই তুমিও রেহাই পাবে না।

আমি হত্যা করিনি তাকে

তুমিই হত্যা করেছে, এবং আমি নিজে তার মৃতদেহের পাশে তোমার সিগারেট কেসটা কুড়িয়ে পেয়েছি এবং তুমি তার সঙ্গে গভীর রাত পর্যন্ত বেলকুনির হেলনা চেয়ারে বসে আলাপ করেছিলে।

কে তুমি? তুমি এসব জানলে কি করে?

সব জানি। তুমিই মিঃ আহম্মদের হত্যাকারী এ কথা তখনই বুঝেছি যখন আমি নিহত আহম্মদ সাহেবের বাংলোয় গিয়ে পৌঁছে দেখেছিলাম।

হত্যাকান্ডের দিন আমি........

লুকোতে চেষ্টা করবেন না মিঃ হুদা। এতক্ষণ রাগের বশে আপনাকে তুমি সম্বোধন করেছি। এ জন্য আমি দুঃখিত। এবার বলুন কেন তাকে হত্যা করেছিলেন? একজন নিরীহ নিষ্পাপ ন্যায়পরায়ণ পুলিশ প্রধানকে এভাবে কেন আপনি হত্যা করলেন জবাব দিন।

যদি না দেই?

তাহলে এই মুহূর্তে মৃত্যুবরণ করবেন।

আর যদি সত্য কথা বলি?

এ মুহূর্তের জন্য আপনি মুক্তি পাবেন তবে বিচারে আপনার যা হয় হবে।

মিঃ হুদা ভাবলেন সত্য বললে যদি জীবনে রক্ষা পাই তাহলে এ মুহূর্তে তাই শ্রেয়। পরে বিচারে দেখা যাবে। তার প্রচুর অর্থ আছে, এক্ষণে বিপদমুক্ত হওয়াটাই বড় কথা।

কি ভাবছেন মিঃ হুদা?

হাঁ, আমি তাকে হত্যা করেছি......

আশ্চর্য আমি হবো না, কারণ আপনার সিগারেট কেসটাই আমাকে জানিয়েছে আপনি বন্ধু সেজে তাঁকে হত্যা করেছেন। সিগারেট কেসে যে সিগারেট রয়েছে তারই অর্ধদগ্ধ টুকরা এবং তা পূর্ব দিনের নয়, রাতের পান করা সিগারেটের অর্ধাংশ। আপনাকে আমি বহুলবার ঐ সিগারেট কেস হতে উক্ত সিগারেট বের করে পান করতে দেখেছিলাম এমনকি মিঃ আহম্মদের সামনেও আপনি ঐ সিগারেট কেসটা বাড়িয়ে ধরেছেন বহুবার।

হাঁ, সে কথা সত্য।

আপনি হাতে রুমাল জড়িয়ে নেবার সময় ভুল করে সিগারেট কেসটা ঘুমন্ত মিঃ আহম্মদের পাশে রেখেছিলেন। হাতে রুমাল জড়িয়ে ঘুমন্ত আহম্মদকে হত্যা

করার পর আর সিগারেট কেসটা হাতে তুলে নিতে ভুলে গিয়েছিলেন। কারণ আপনি তখন রুমালখানা দ্রুত পকেটে রেখে পালাবার সুযোগ খুঁজছিলেন।

তুমি কি তাহলে আশেপাশে কোথাও ছিলে?

না।

তবে এত জানলে কি করে?

আপনি জানেন না মিঃ হুদা, মৃত কথা বলতে না পারলেও তার চারপাশের বস্তুগুলো কথা বলে। কারণ হত্যাকারী কাউকে হত্যা করার পর স্বাভাবিক থাকতে পারে না। পালিয়ে যায় বটে কিন্তু রেখে যায় হত্যার চিহ্ন, যা চিহ্নিত করে সত্যিকারের হত্যাকারী কে। আপনি আহম্মদ সাহেবকে হত্যা করার পর তার কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসেন এবং গাড়ি–বারান্দায় আপনার গাড়ি অপেক্ষা করছিলো সেই গাড়ি নিয়ে চলে যান। দারোয়ান বা অন্য কেউ আপনাকে বাধা দেয় না, কারণ আপনি ইচ্ছাকৃতভাবে পূর্বেও মিঃ আহম্মদের বাড়ি থেকে এমনি রাত করে নিজের বাড়ি ফিরতেন কারণ আপনার উদ্দেশ্য পূর্ব হতেই পথ পরিষ্কার করে রাখা। আপনি বন্ধু বেশে প্রখ্যাত পুলিশ সুপার মিঃ আহম্মদের মনের কথা এবং তার চিন্তাধারার মূল উদ্দেশ্য জেনে নিয়েছিলেন এবং আপনি জানতে পেরেছিলেন বন্ধু হলেও একদিন কর্তব্যের খাতিরে আপনাকে সে বিপদে ফেলতে পারে আর সেই কারণেই আপনি তাকে আপনার পথ থেকে সরিয়ে ফেললেন অতি কৌশলে……কিন্তু অন্যায় কোনোদিন স্থায়ী হতে পারে না, অন্যায়ের ভিত দুর্বল। আপনি উদ্দেশ্য সফল করতে চাইলেও জয়ী আপনি হতে পারেননি মিঃ হুদা। আপনি চাকরি ছেড়ে আজ ব্যবসায় নেমেছেন। অসৎ ব্যবসা যা দেশ ও দশের সর্বনাশ ডেকে আনছে। আপনি নিজ স্বার্থের জন্য এমন ধরনের অপকর্ম করে যাচ্ছেন যা আপনাকে দিন দিন অধঃপতনের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

তুমি যেই হও আমাকে মুক্তি দাও। আমি হত্যা করেছি আমার পরম বন্ধু মিঃ আহম্মদকে। কিন্তু তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও, আমাকে মুক্তি দাও……

ক্ষমা! আমি আপনাকে ক্ষমা করবোর

হাঁ, আমাকে মুক্তি দাও।

মুক্তি আমি দেব, আজ বাসায় ফিরে যান কিন্তু সাবধান পালাতে চেষ্ট করবেন না। কারণ চারদিকে আপনার বেড়াজাল। আর ক্ষমা, ক্ষমা করবেন মিঃ আহম্মদের স্ত্রী–পুত্র–কন্যা।

কে তুমি?

বড় সখ জানার, তাই না?

হাঁ বলো কে তুমি?

ড্রাইভার ইয়ার আলী তার মুখের দাড়িগোঁফ খুলে ফেলল, লাইট পোষ্টের স্বল্প আলোতে মিঃ হুদা চমকে উঠলেন–মিঃ নূর, আপনি?

হাঁ, শুধু আমি নই, আমার সঙ্গে আছে আর একজন টেপরেকর্ডার ক্ষুদে মেশিন। যা আদালতে কথা বলবে।

মিঃ হুদার মুখমন্ডল বিবর্ণ ফ্যাকাশে হয়ে উঠলো। তাকালেন তিনি নূরের হাতে রিভলভারখানার দিকে।

[পরবর্তী বই রক্তপায়ী বাদুড় ও দস্যু বনহুর]

পূর্ববর্তী:

« ৭.১৫ বনহুর ও জলদস্যু

পরবর্তী:

৭.১৬ ভৌতিক গহ্বর »